Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাইজিন রহমান

রোলঃ 216020194227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাইজিন রহমান

রোলঃ 216020194227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাইজিন রহমান, আইডিঃ 216020194227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Taizin Rahman Rihat

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাইজিন রহমান

আইডিঃ 216020194227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সূচনা

بسم الله الرحمن الرحيم

মানুষ সামাজিক জীব। একটি মানব সমাজে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন জনপদসহ আল মাদীনা মুনাওয়ারাহ নামক আদর্শ রাষ্ট্রেও বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। ইসলাম মানবতার জন্য একমাত্র যোগ্য, অনুকরণীয় আদর্শ পথ ও পন্থা।

মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এ অর্থে ইসলামী বিশ্বের বিকাশ সূচিত হয়েছিল মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ড জুড়ে ইসলামী বিশ্বের অবস্থান। পৃথিবীব্যাপী মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের ভৌগলিক অবস্থান, গোটা মানবজাতির এক পঞ্চমাংশেরও বেশি মুসলিমগণের রাজনৈতিক ঐক্য এবং সর্বোপরি মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের অর্থনৈতিক শক্তি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান মুসলিম বিশ্ব ইসলামবিরোধী শক্তির অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু উগ্রবাদী শক্তি একজোট হয়েছে। বেসামাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাঁর সহযোগীরা ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য জঙ্গীবাদ, ইসলাম ফোবিয়া ইত্যাদি মুখরোচক সিন্ডিকেটেড সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুসলিম রাষ্ট্র গুলোকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করছে। বিশেষ করে বেশ কিছু দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর চালানো নির্মম নির্যাতন এবং সে ব্যাপারে তথাকথিত বিশ্ব বিবেকের নিশ্চুপ ও অনৈতিক ভূমিকায় প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও শক্তি না থাকায় এর প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উপায় তাঁরা খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে মুসলিম শাসকগণও প্রায় সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হীন স্বার্থে এ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে টু'শব্দটি পর্যন্ত করছেন না। এমতাবস্থায় মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষের এ লড়াইয়ে বিজয় লাভ করতে হবে।

কোন মহান আদর্শের সফল বাস্তবায়ন, কোন জাতির পুনর্গঠন ও তাঁর সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনে যে পরিমাণ বৈষয়িক শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসিক শক্তির। যে জাতির

কাছে প্রয়োজনীয় সকল বৈষয়িক উপকরণ বিদ্যমান, কিন্তু আদর্শ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প, অটল সিদ্ধান্ত ও অপরাজেয় মনোবল নেই, সভ্যতার সংঘাত ও আদর্শিক সংগ্রামে কুপোকাতই তাদের ললাট লিখন। পক্ষান্তরে যে জাতির বৈষয়িক আসবাবের যথেষ্ট অভাব রয়েছে বটে, কিন্তু সাহস-মনোবলে কোনরূপ ঘাটতি নেই, কালের ইতিহাসে তারাই বিজয়ী, তারাই শ্রেষ্ঠ। প্রথম যুগের মুসলিমগণের কৃতিত্ব গাঁথা সোনালী ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

শীর্ণ বদন, জীর্ণ বসন, উদরশূন্য মুসলিম পক্ষ। পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র নেই। অথচ প্রতিপক্ষ সব ধরনের সমরাস্ত্রে সজ্জিত। সৈন্য সংখ্যায়ও মুসলিমগণের কয়েকগুণ। তথাপি বিজয়ের বরমাল্য মুসলিমগণের কণ্ঠলগ্ন হয়। যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে ঈমান, তাওয়াক্কুল, দৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের অদম্য স্পৃহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণের দুরন্ত সাহস, আকাশ ছোঁয়া মনোবলের সামনে সকল বাতিল পরাশক্তি মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষ্ণ-শিরকের নিশ্চিদ্র আঁধার চিরে উদিত হয় ইসলামের দীপ্ত সূর্য। বর্বরতা ও পাশবিকতার ধ্বংসস্তুপের উপর নির্মিত হয় মানবতার নতুন মিনার। কায়েম হয় আল্লাহর দ্বীন, মুক্ত হয় মানবতা, প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়-ইনসাফ, উঁচু হয় আল্লাহর কালেমা।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মাত্র চৌদ্দটি শতকের ব্যবধানে অনুসারীদের গাফলতির কারণে ইসলামের আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। এত কালের বিশ্বজয়ী মুসলিম জাতি ঈমান- আমলের দুর্বলতা, কর্ম বিমুখতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করে চলছে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের সোনালী ইতিহাস, হারিয়ে ফেলেছে গৌরবময় ঐতিহ্য, খুইয়ে ফেলেছে আকাশ ছোঁয়া মনোবল, দৃঢ়চেতা মন ও সতেজ ঈমান। হতাশা ও আত্মবিস্মৃতি আজ পুরো জাতিকে অবশ করে দিয়েছে। এক সময়কার সিংহ- শার্দুলের এখন আকৃতিই অবশিষ্ট রয়েছে-প্রকৃতি নেই; দেহটাই আছে, আত্মা নেই। দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বিজয় কেতন ওড়ানোর মহৎ উদ্যোগ তাদের নেই। নেই তাদের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কোন শুভ চিন্তা। অধিকন্তু বেশীরভাগ মুসলিমই ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিয়ে দারুন সন্দিহান ও চরম হতাশ। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁরা যেন এ ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, এ যুগ ফিৎনা-ফাসাদের যুগ, মুসলিমগণের পতনের যুগ, ইমাম মাহদি বা ঈসার (আ.) আগমনের পূর্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। অথচ এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত: বর্তমান মুসলিম উম্মাহর যে অবনতি ও অধঃপতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে মূলতঃ তা মুসলিম উম্মাহর ঈমানী দুর্বলতা, হীনমন্যতা, হতাশা, সংশয়, সন্দেহ তথা মানসিক বিপর্যয় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। নচেৎ প্রথম যুগের মুসলিমগণের চেয়ে বর্তমানে বাহ্যিক শক্তি- উপকরণ বহু

গুণে বেশী। মুসলিম উম্মাহর রয়েছে ৫৭টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, প্রায় ১৮০ কোটি জনগণ, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিশ্বের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ তেল সম্পদ, যার উপর নির্ভর করে আধুনিক বিশ্ব চরম উৎকর্ষতা লাভ করছে। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণের এ চরম বিপর্যয়ের কী কারণ থাকতে পারে? উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এতগুলো বাহ্যিক উপকরণের সাথে যদি মুসলিমগণ সহীহ ঈমান, বিশুদ্ধ আমল, পূর্ণ ইয়াক্বীন ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হয়; হতাশা, হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে, তাহলে অবশ্যই মুসলিমগণ পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ী ঝান্ডা উড্ডীন করতে সক্ষম হবে। কাজেই এ মুহুর্তে খুবই প্রয়োজন হতাশা, হীনমন্যতা ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ ও লক্ষণ চিহ্নিত করে এমন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মাধ্যমে মুসলিমগণ মরণ ব্যাধি এ মানসিক বিপর্যয় উত্তরণ করে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করার মাধ্যমে উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করতে পারে।
ইসলামি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সাথে ইসলাম কোন ধরনের আচার-আচরণের অনুমোদন দিয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম কী নির্দেশনা রেখে গেছে, প্রতিটি মুসলিমের এ ক্ষেত্রে ইসলামকে অনুসরণের জন্য, সে শিক্ষার মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যকার মেলামেশা, সম্পর্ক গড়া ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের আদানপ্রদানের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে, এ বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ইসলামি জীবন-বিধান পর্যালোচনা করলে, কখনো বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা, আবার কখনো তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ানোর চিত্র পরিলক্ষিত হয়। আমাদের সমাজেও এ নিয়ে অনেকের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তিও রয়েছে। কেউ তাদের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যেন তারা মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে বেশি কাছের। আবার কেউ বা তাদের বিপক্ষে এমন আক্রোশমূলক অবস্থান নিয়েছেন, যেন তারা সদ্ব্যবহারটুকু পাওয়ার অধিকারও রাখেন না। বরং তাদের অনেকেই অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করাকে বড় মাপের 'ইবাদাত বলেও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে থাকেন। ওদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও দিতে চান না। সেজন্য দুপক্ষের অবস্থানই ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা এখন সময়ের দাবি। আসলে ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য উদারতার যে বাহু প্রশস্ত করে দিয়েছে, তা অন্য যে কোনো ধর্মে একেবারেই বিরল। কোনো আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয়, কারো প্রতি অত্যাচারের ছড়ি ঘোরানোরও উদ্দেশ্য নয়। সমগ্র মানবজাতিকে মানুষের দাসত্বমুক্ত করে একমাত্র তাদের রবের দাসে পরিণত করাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু এখনকার সময়ে অমুসলিমদের অতৎপরতা এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে মুসলিম উম্মাহর হাল করুণ। নিপিড়ীত হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে বছরের পর

বছর।নির্যাতিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। মিশন সফল করার জন্য সবসময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সবই তারা নিচ্ছে।

আলোচ্য গবেষণা কর্মটিতে আমাদের মুসলিম উম্মাহর পরিচয় এবং ধাপে ধাপে অপতৎপর অমুসলিম জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং তাদের অপতৎপরতা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হবে।

ان شاء الله

মুসলিম উম্মাহর পরিচয়

মুসলিম উম্মাহ শব্দটি 'উম্মাহ মুসলিমাহ' শব্দ দ্বয়ের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি কুর'আন মাজীদে একটি অনন্য সাধারণ পরিভাষা। কুর'আনে উম্মাহ শব্দটি মোট ৬৫ বার এসেছে। একবচনে ৫২ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমা ভাষায় এর কোন প্রতিশব্দ নেই। গোষ্ঠী ও জাতি অর্থে কুর'আনে শব্দটি ব্যাপক ব্যাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ মূলত জাতিসত্তা, বর্ণ, ইত্যাদি নির্বিশেষে ঈমানদারদের দল বা গোষ্ঠী কে বুঝানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কুর'আনে বলা হয়েছে:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(আল কুরআন ২:১২৮)

অর্থাৎ, " হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াময়।

এ প্রসঙ্গে Encyclopedia Of Islam এ বলা হয়েছে, The word Ummah refers to "the people" in Arabic, more specifically to Muslim people with a

common ideology and culture. "Ummah" is also said in the Quran by Allah referring to Muslims. It is more commonly used in Islamic countries. Muslim Ummah refers to the unity of Muslims all over the world. The Muslim Ummah is responsible for upholding the religion and therefore benefiting the Community regardless whether the community is Muslim or non- Muslim. Apart from its strict religious connotation, the word "Ummah)أمة("is used in Arabic in the general sense of "Community", as in" الأمم والشعوب community of peoples"). The Arabic term for the United Nations in Arabic is" الأمم المتحدة The United Ummahs"). In its Islamic sense of the community of Muslims, the word is usually preceded in Arabic by the definite article(الأمة .The Ummah"). অর্থ্যাৎ, "উম্মাহ (আরব)أمة :িএকটি আরবি শব্দ ও ইসলামি পরিভাষা যা দ্বারা মুসলিম জাতি বা সম্প্রদায় বোঝানো হয়। তবে এর সাথে নৃতাত্ত্বিক বা ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ণীত জাতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দ্বারা অনুরূপ বহুসংখ্যক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সামগ্রিক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। ইসলাম অনুযায়ী যেকোনো নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক বা ভাষাভাষীর মুসলিম ব্যক্তি উম্মাহর সদস্য হিসেবে গণ্য হয়।

Reuven Firestone Jihad, The Origin of Holy War in Islam (New York: Oxford University Press, 1999), p. 118

ভাষা, বর্ণ, জাতিসত্তা, গোত্র নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন আদর্শ, ধর্ম, আইন, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সুসমন্বিত, সংঘবদ্ধ জাতি। মহানবী (স.) তাঁর অনুসারীদের উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ নব উত্থিত সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ড. ইব্রাহিম মাদকুরি বলেন,

و جماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد - وتجمعهم صفات موروثة - ومصالح واماني واحدة - أو يجمعهم أمر واحد من دين او مكان او زم

আর মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ গোষ্ঠীর লোকজন একই সুত্রে গাঁথা। তাঁদের সম্মিলিত হওয়ার গুণাগুণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এবং তাঁদের স্বার্থ, রুচি ও চাহিদা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। আর তাঁরা সম্মিলিত হয়ে কাজ করতে পারে যেকোন দ্বীন, সময় অথবা স্থানের ভিত্তিতে।

:

ড. ইব্রাহিম মাদকরি, আল মুজামুল ওয়াসীত (ঢাকা: আল মাকতাবা আল) ইসলামিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩

ড. হামিদুল্লাহর মতে, "উম্মাহ ধারণাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে মদীনার লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদে' শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে। উম্মাহ সে দলকে বলা হয়, যারা একটি সর্বসম্মত বিষয়ে বা উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। যেসব লোকের মধ্যে কোন অভিন্ন মৌলিক বিষয় থাকে, তাদেরকে উক্ত মৌলিক বিষয়ের বিচারেই 'উম্মাহ' বলা হয়। মুসলিমগণকে যে অভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে উম্মাহ বলা হয়েছে তা বংশ, ভৌগলিক বাসভূমি বা
অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নয় বরং তা হচ্ছে তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও তাঁদের দলের নীতি। ও আদর্শের ভিত্তিতে।
ড. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ, The First Written Constitution in the world (লাহোর: আশরাফ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৫), পৃ. ৪৫

যেদিন থেকে মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবকে এক আল্লাহকে নিজেদের প্রভু এবং অন্যান্য প্রচলিত মানুষ আবিষ্কৃত সব প্রভুত্বকে বাতিল বলে মেনে নেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মুসলিমগণ নিজদের যেমন একজাতি, বিশ্বাসী জাতি বলে মনে করে যাচ্ছেন তেমনি অমুসলিমগণও মুসলিম জাতিকে একজাতি বলে জ্ঞান করে আসছে, যেমন, যেখানেই আরব, তুর্কি তাতার, মোগল, আফগান জাতীর কেউ ইসলাম প্রচার করতে এসেছেন বা রাজ্য জয় করতে এসেছিল বা ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছিল সেখানেই তাদেরকে স্থানীয়রা তাদের আঞ্চলিক পরিচয়ে কেউ পরিচিত করে নাই বা সে ইসলাম প্রচারকারী, রাজ্য জয়কারী বা ব্যবসায়ীকে তাঁর মাতৃভাষা দিয়ে পরিচয় করে নাই, ভাষা এবং অঞ্চল যা হোকনা কেন। শুধুমাত্র মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত করা হয়েছে।

অভিধানগত ভাবে উম্মাহ শব্দটি দ্বারা কি বুঝায়। উম্মাহ শব্দটির মূল বলে প্রাচীন আরবি একাধিক শব্দের কথা জানা যায়, যেমন- আম্মা, ইমামা, উমুমা এবং উম্ম।

আম্মা শব্দ দ্বারা- যাওয়া, গ্রহণকরা, অবলম্বন করা, সংশোধন করা, দেখতে যাওয়া ইত্যাদি বুঝায়।

ইমামা শব্দটি দ্বারা- পথ দেখিয়ে দেওয়া, নেতৃত্ব করা।

উমুমা শব্দটি দ্বারা- মা হওয়া, রাষ্ট্র

উম্ম শব্দটি দ্বারা মা, উৎস, মূল, ভিত্তি সারকথা ইত্যাদি বুঝায়।

সে সব শব্দ থেকে উম্মাহ আর উম্মাহ যে জাতি হিসাবে বুঝায় তাঁর প্রমাণ আজকের পৃথিবীর জাতিসংঘ তথা ইউনাইটেড নেশনকে আরবিতে আল উমাম আল মুত্তাহিদাহা বা সংযুক্ত জাতি বলা হয়ে থাকে। এই শব্দটিকে বিশ্বের সকল আরবি ভাষীরা এ ভাবেই ব্যবহার করে আসছেন। গত দুশো বছর যাবত যে ভাবে ভৌগলিক বা ভাষা বা রাষ্ট্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ চালু হয়েছে ইসলামী জাতীয়তাবাদ তত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়। সাধারণভাবে একই ভাষাভাষী, সংস্কৃতি, ইতিহাস, বর্ণ, জীবনাচরণ বিশিষ্ট লোক সমষ্টিকে জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইসলাম যে উম্মাহ বা জাতির কথা উল্লেখ করেছে, তা নির্দিষ্ট কোন ভাষা, বর্ণ, গোত্র, এমনকি কোন সীমানার বন্ধনে আবদ্ধ নয়। বরং সমগ্র পৃথিবীর কোন স্থানে বসবাসকারী তাওহীদে বিশ্বাসী পবিত্র কুর'আনের অনুসারী, ইসলামের পতাকা তলে সমবেত জাতিই মুসলিম জাতি বা মুসলিম উম্মাহ। পবিত্র কুরআনে উম্মাহ ওয়াহিদা বলতে আল্লাহ তা'আলা এই মুসলিম উম্মাহকেই বুঝিয়েছেন।*প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫*

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

অর্থাৎ, "তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদত করো"।*আল কুরআন ২১:৯২*

পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মাঝে ২০০ কোটি মুসলিম। বর্তমানে তারা বিভিন্ন দেশ-জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের জীবনাচরণও ভিন্ন ভিন্ন। অথচ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার সব মুসলিম এক জাতি বা উম্মাতুন ওয়াহিদা। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের জন্যেই মুসলিম উম্মাহর উদ্ভব। এই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের যে অঞ্চলে বাস করেন না কেন, তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পরবর্তী সব কার্যক্রম আল কুর'আন এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসারে প্রতিপালন করা হয়। এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে

কোন শ্রেণী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিয়ে সাদির বন্ধনে আবদ্ধ হতেও কোন মানা নেই। অথচ এক ভাষা ভাষী এক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও মুসলিম উম্মাহ অন্য ধর্মীদেরকে বিয়ে করতে পারে না। এই উম্মাহর লক্ষ্য যেমন বড়, তেমনি এর আদর্শ, অবস্থান ও কর্মনীতিও সকল দূর্বলতা, নেতিবাচকতা, সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। ভাষার পার্থক্য তাদেরকে বিভক্ত করে না। অবস্থানের দূরত্ব তাদের ভালোবাসার কাছে পরাস্ত হয়। বর্ণের বৈচিত্র বা গঠনের তারতম্য তাদের ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বে কোনও খাদ তৈরি করতে পারে না।

ড. আব্দুল রশিদ মতিনের মতে, Ummah is a universal order enclosing the entire collectivity of Muslims inhabiting the globe, united by the bond of one strong and comprehensive ideology of Islam. It is indispensable for the actualization of the divine will in space time and for the achievement of happiness in this world and salvation in the hereafter

অর্থাৎ, "উম্মাহ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যত মুসলিম বাস করে তাদের সমন্বয়ে এবং ইসলামী দর্শন ও চেতনার ঐক্যবন্ধনে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণা। স্থানকালের পরিসীমা অতিক্রমকরে ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের সামগ্রিক মানবগোষ্ঠী হচ্ছে উম্মাহ, যার লক্ষ্য ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি

আবদুল রশিদ মতিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট ২০০৫), পৃ. ৪৫

উম্মাহর কতকগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে। যেমনঃ

১. মুসলিম উম্মাহর ধারণা উম্মাহর প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে।

২. শরীয়াহকে বৈধতার চূড়ান্ত উৎস বলে মনে করে।

৩. আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ধারণা তাওহীদের ভিত্তিতে গঠিত।

৪. সকল কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত বিলুপ্ত করে।

৫. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে।

৬. সমস্ত বিশ্ব মুসলিমকে একই উম্মাহে পরিণত করে।" *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫*

মোদ্দাকথা, তাওহীদের ভিত্তিতে সংস্থাপিত মুসলিম উম্মাহ সার্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত ও সুসংগঠিতভাবে সমন্বিত। মুসলিম উম্মাহর পরিচয়ে কুর'আনের দুটি আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। একটি হলো:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থাৎ, "দুনিয়ার সর্বোত্তম জাতি তোমরা। মানুষের হেদায়াত ও কল্যাণ বিধানের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলবে। আহলে কিতাব ঈমান আনলে তা তাদের পক্ষেই কল্যাণকর হত, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদার ও পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই সীমালঙ্গনকার।

আল-কুর'আন, ৩: ১১

এ আয়াতে প্রথমত মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, তাদের তৈরি করা হয়েছে গোটা বিশ্ব-মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করা, বিশ্ববাসীকে সৎপথে পরিচালিত করা, অসৎপথে বাধা দেয়া এবং সর্বোপুরী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য। মূলত আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি হলো- মুমিন ব্যক্তি বিশ্বের সকল মানুষকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে। কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবে না, কাউকে গোলাম ও বানাবে না। আল্লাহর প্রতি ঈমান বা তাওহীদ বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি হলো- মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া কারো সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মানবে না। এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মেনে নেয়ার পর সব মানুষ পরস্পরের ভাই। কেউ কারো প্রভু নয়, কেউ কারো গোলাম ও নয়। আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়ার পর এ বিশ্বাসে যারা বলিয়ান হয় তাদেরকে স্রষ্টার ইবাদতের পাশাপাশি সৃষ্টির খেদমত করতে হবে। এটাই ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ জন্যই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে রাসূলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে তাদেরকে মানবতা-মনুষ্যত্বের পতাকাবাহী হিসেবে জাতী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকতে বলা হয়েছে। মানুষের কল্যাণের পথ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিশ্বাসে বলীয়ান

হয়ে সকল হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানের সংকল্পের অধিকারী হওয়াই মুসলিম উম্মাহর এ পরিচয়ের অনিবার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আয়াতটি হলো:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

অর্থাৎ, "এভাবে তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী জাতিতে পরিণত করা হয়েছে, যাতে করে তোমরা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পারো, আর তোমাদের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা আল্লাহর রাসূল
আল-কুর'আন, ২: ১৪৩

পশ্চিমা গোষ্ঠী আধুনিক বিশ্বে মধ্যমপন্থী বা মডারেট শব্দটি বেশি বেশী ব্যবহার করে আসছে। এর আড়ালে-আবডালে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আর মুসলিম জাতিকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। অথচ, ইসলামই একমাত্র আদর্শ যার সাথে চরমপন্থার কোন সম্পর্ক বা সংশ্রব নেই। জাতি হিসেবে মুসলিমগণ সর্বযুগেই কমবেশি শান্তি নিরাপত্তার প্রতীক এবং মানবতা-মনুষ্যত্বের ধারক বাহক হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। সত্যিকার অর্থে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে কোন প্রকারের উগ্রবাদ বা চরমপন্থার অভিযোগ আনার সুযোগ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘঠিত যেসব ঘটনাকে পুজি করে মহল বিশেষ ইসলাম ও মুসলিমগণের ব্যাপারে উপরিউক্ত অভিযোগের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে তা ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে মুসলিম উম্মাহর যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তাঁর অনিবার্য দাবি হলো মুসলিম উম্মাহকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্যে সার্বিকভাবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে হবে।

শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সার্বিকভাবে মানুষের সমাজে শান্তি, কল্যাণ, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে তাদের সক্ষম হতে হবে। বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত মিশন। এটা শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলিমগণ সাম্প্রদায়িক নয়, তারা শুধু নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সুখ- শান্তি, সমৃদ্ধি- কল্যাণ ও ইনসাফ নিশ্চিত করাই তাদের পবিত্র দায়িত্ব। বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মধ্যে এ আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রচার, প্রসারের পথে ইসলামী আদর্শ কোন প্রতিবন্ধকতা নয়ই বরং সহায়ক-এটাও বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মুসলিম উম্মাহর উত্থান

আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আর ইসলামের অনুসারীদের বলা হয় মুসলিম। মানুষের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। এর উদ্ভাবক, প্রবর্তক ও প্রণয়নকারী কোন মানুষ নয়। আল্লাহ একে একমাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এ কারণে যে, মানুষের জীবনের সম্ভাব্য সকল সমস্যার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত সমাধান আছে ইসলামে। মানুষের এমন কোনো সমস্যা নেই, জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম তাঁর কল্যাণময় বিধান প্রবর্তন করেনি। আর ইসলাম নিছক কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতও নয় যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না। বরং ইসলাম হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ জীবনব্যবস্থা। হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রচারিত ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থাকে ইসলাম আখ্যা দেয়া হলেও আল্লাহ প্রেরিত সকল ধর্মই ইসলাম ধর্ম। পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল যে জীবনব্যবস্থা বা ধর্ম প্রচার করেছেন তাঁর প্রতিটিরই অভিন্ন নাম হলো ইসলাম। ঈমানের একটি উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য এই যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পূর্ববর্তী সকল নবী- রাসূলের প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের অনিবার্য অঙ্গ। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে মহানবী (স.) পর্যন্ত নবী রাসুলগণের মধ্য থেকে কোনো একজনকে অবিশ্বাস করে বা কারো প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করে মুসলিম হওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে কুর'আন মাজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা বিষয়টিকে প্রামাণ্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

অর্থাৎ, "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।
"

আল কুরআন ৪২:১৩

মুসলিম উত্থানপূর্ব ও সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দি ছিল মানব ইতিহাসের সর্বাধিক অন্ধকারময় ও অধঃপতিত যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবতা যেভাবে অধঃপতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল এ সময় সে তাঁর চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। পয়গাম্বরদের দাওয়াতের আওয়াজ বহুকাল চাপা পড়ে গিয়েছিল। দ্বীনদার লোকেরা দীনের আমানত নিজেদের বুকের ভেতর আগলে রেখে জীবন ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মঠ, গির্জা ও প্রান্তরের এক কোনে ঠাঁই নিয়েছিল এবং জীবন সংগ্রাম, এর দাবি ও রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে বসেছিল।
মানুষ সামাজিক জীব। একটি মানব সমাজে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন জনপদসহ আল মাদীনা মুনাওয়ারাহ নামক আদর্শ রাষ্ট্রেও বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। ইসলাম মানবতার জন্য একমাত্র যোগ্য, অনুকরণীয় আদর্শ পথ ও পন্থা।
ইসলামি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সাথে ইসলাম কোন ধরনের আচার-আচরণের অনুমোদন দিয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম কী নির্দেশনা রেখে গেছে, প্রতিটি মুসলিমের এ ক্ষেত্রে ইসলামকে অনুসরণের জন্য, সে শিক্ষার মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যকার মেলামেশা, সম্পর্ক গড়া ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের আদানপ্রদানের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে, এ বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ইসলামি জীবন-বিধান পর্যালোচনা করলে, কখনো বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা, আবার কখনো তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ানোর চিত্র পরিলক্ষিত হয়। আমাদের সমাজেও এ নিয়ে অনেকের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তিও রয়েছে। কেউ তাদের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যেন তারা মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে বেশি

কাছের। আবার কেউ বা তাদের বিপক্ষে এমন আক্রোশমূলক অবস্থান নিয়েছেন, যেন তারা সদ্ব্যবহারটুকু পাওয়ার অধিকারও রাখেন না। বরং তাদের অনেকেই অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করাকে বড় মাপের 'ইবাদাত বলেও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে থাকেন। ওদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও দিতে চান না। সেজন্য দুপক্ষের অবস্থানই ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা এখন সময়ের দাবি। আসলে ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য উদারতার যে বাহু প্রশস্ত করে দিয়েছে, তা অন্য যে কোনো ধর্মে একেবারেই বিরল। কোনো আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয়, কারো প্রতি অত্যাচারের ছড়ি ঘোরানোরও উদ্দেশ্য নয়। সমগ্র মানবজাতিকে মানুষের দাসত্বমুক্ত করে একমাত্র তাদের রবের দাসে পরিণত করাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু এখনকার সময়ে অমুসলিমদের অতৎপরতা এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে মুসলিম উম্মাহর হাল করুণ। নিপিড়ীত হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে বছরের পর বছর।নির্যাতিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। মিশন সফল করার জন্য সবসময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সবই তারা নিচ্ছে। অমুসলিমদের কিছু গোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা জানবো।

খ্রিষ্ট ধর্ম

খ্রিষ্ট ৪র্থ শতাব্দীতেই খ্রিষ্ট ধর্ম একটি জগাখিচুড়ীতে পরিণত হয় যার ভিতর গ্রীক পৌরণিক কাহিনী, রোমান পৌত্তলিকতা, মিসরীয় নব্য-প্লেটোবাদ ও বৈরাগ্যবাদ যোগ হয়ে ছিল। হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) এর সহজ সরল শিক্ষামালার উপাদান এই জগাখিচুড়ির ভেতর এইভাবে হারিয়ে গিয়েছিল যেভাবে বারিবিন্দু বিশাল সমুদ্র বক্ষে পতিত হয়ে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্ট ধর্ম কতিপয় নিষ্প্রাণ প্রথা ও নিরানন্দ আকীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায় যা না পারত আত্মার মাঝে উত্তাপ সঞ্চার করতে আর না পারত জ্ঞান- বুদ্ধির কারণ হতে। আবেগ-উদ্দীপনাকে তা সচল ও সক্রিয় করে তুলতে পারত না। তার মধ্যে এ যোগ্যতা ও ছিল না, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সঙ্কটে মানব কাফেলা নেতৃত্ব দিবে। এর উপর ধর্মের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল এর অতিরিক্ত যার পরিণতি হলো এই, খ্রিষ্ট ধর্ম জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবর্তে সে নিজেই এ পথে বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং শতাব্দীর অব্যাহত অধঃপতনের দরুন কেবলই পৌত্তলিকতার ধর্মে পরিণত হলো।

ইংরেজী ভাষায় কুর'আন কারীমের অন্যতম বিখ্যাত অনুবাদক জর্জ সেল (Sale) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলেন, The worship of saints and images, in particular, was then arrived at such a scandalous pitch that it even

surpassed whatever is not practiced among the Romanists. অর্থাৎ, "খ্রিষ্টানরা সাধু-সন্ত ও হযরত ঈসা মাসীহ (আ) এর মূর্তির পূজার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করেছিল যে, এ যুগের রোমান ক্যাথলিকরাও সেই সীমায় পৌছতে পারেনি। "

Abdul Hameed Siddiqu, The Life of Muhammad: Arabia Before Islam (Sale's Translation: 1896), p. 62

ইহুদি ইতিহাস

ইহুদিদের আবির্ভাব মানব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল কোনো যুগেই কম ছিল না। আজকের আধুনিক বিশ্ব যেসব খুঁটির (অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি) ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রতিটির পেছনেই রয়েছে ইহুদিদের অদৃশ্য আধিপত্য। জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হয়ে এক টুকরো নিরাপদ ভূমির খোঁজে তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছে যাযাবরের মতো। নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা আজ পর্যন্ত যত কৌশল উদ্ভাবন করেছে, তার অধিকাংশই সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধুসুলভ ছিল না। পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতি ও অসাধু অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দরুন তারা বারংবার বিতর্কিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

রাশিয়ায় ইহুদিরাই ছিল বলশেভিক বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে তারা জবাই করেছে লাখো তাজা প্রাণ। সেই বিপ্লবের যারা খলনায়ক, তারাই আজ আমাদের চোখে মহানায়ক। জার্মান সাম্রাজ্য পতনের পেছনেও তারা সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক ছিল। তারা বিষাক্ত অণুজীব হয়ে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। এক এক করে দখল করে সেখানকার প্রতিটি শিল্প ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে তারা ইংল্যান্ডকে বানিয়েছে হাতের পুতুল। স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ চুরি করে নিজেদের প্রাচুর্যতাকে করেছে পাহাড়সম। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে রক্তক্ষয়ী অন্তঃকোন্দলে জড়িয়ে হাসিল করেছে নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।
প্রবীণ ও তরুণ ইহুদিরা নিজেদের প্রাচুর্যতা ও উচ্চাভিলাসী মনোভাব কাজে লাগিয়ে আমেরিকাকে একটি যুদ্ধবাজ দেশে পরিণত করেছে, যা আজ তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। হাসিলের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। যেকোনো সরকারের শাসনামলে তাদের জন্য একটি সুবিধাজনক পদ বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখা হয়। হোয়াইট হাউসেও রয়েছে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিষাক্ত মতবাদ ঢুকিয়ে দিতে ইহুদি রাবাইদের যেন

পরিশ্রমের শেষ নেই। তারা বলে- 'আশীর্বাদ চাইলে ইজরাইল যাও। কারণ, আমরাই সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত সম্প্রদায়।'

জনসংখ্যায় এত অল্প হয়েও তারা যেভাবে নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করেছে, তা ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জাতি পারেনি। পুরোনো ছেঁড়া ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করে তা বিক্রি করা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির সবকিছু আজ তারা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিক পরিশ্রমী পদে কাজ করার ব্যাপারে তাদের রয়েছে তীব্র অনীহা। উৎপাদন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ পদগুলোতে সাধারণত জ্যান্টাইলদের ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে সেলসম্যান, ম্যানেজার এবং ক্লার্কের মতো সহজ পদগুলো তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। প্রাচীন প্রুশিয়ানদের এক সমীক্ষা অনুযায়ী- তাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৬৯৪০০ জন। এর মাত্র ছয় শতাংশ অর্থাৎ, ১৬১৬৪ জন ছিল ইহুদি, যার মধ্যে ১২০০০ জনই ছিল ব্যবসায়ী এবং ৪১৬৪ জন শ্রমিক। অন্যদিকে ৯৬ শতাংশ জ্যান্টাইল অর্থাৎ ২৫৩২৩৬ জনের মধ্যে মাত্র ১৭০০০ জন ব্যবসায়ী।

বর্তমান প্রেক্ষাপট অবশ্য ইতিহাস থেকে অনেক ভিন্ন। ব্যাবসা-বাণিজ্যের উঁচু। পদগুলোতে আজ জ্যান্টাইলদের উপস্থিতি পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তাদের সংখ্যা যে হ্রাস পেয়েছে তা নয়; Jews Encyclopedia অনুযায়ী- বর্তমানে বিশ্বের বৃহদাকার প্রায় সকল বিপণিবিতান তারাই পরিচালনা করছে। ট্রাস্ট, ব্যাংক, কৃষি ও খনিজ সম্পদের মতো আরও অনেক শিল্প রয়েছে, যা তাদের কবজাধীন হয়ে পড়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান এখনও জ্যান্টাইলদের মালিকানায় রয়েছে, তার পেছনেও ইহুদিদের বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী কাজ করছে। প্রকাশনী শিল্পে তারা কতটা ক্ষমতাধর, তা সামনের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে। থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতে তাদের দ্বিতীয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

জার্মান লেখক Werner Sombart তার বই Jews and Modern Capitalism- উল্লেখ করেন-

'যদি আমেরিকার অভিবাসন হার, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর জন্মহার এবং উন্নয়নসূচক একই ধারায় চলতে থাকে, তবে আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছর পর এ দেশ হবে নিগ্রো, ক্রিতদাস ও ইহুদিদের দেশ। যেখানে তারাই হবে ক্ষমতাধর জনগোষ্ঠী।'

আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে দুটি বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান রাখা উচিত।

প্রথমত। পৃথিবীর সব ইহুদিই সম্পদশালী নয়। তাদের মাঝেও ধনী-গরিব শ্রেণি আছে। তবে গরিব শ্রেণির দরিদ্র্যতার মূল কারণ- তাদের সম্পদশালী জ্ঞাতি ভাইয়েরা। মূলত কৌশলগত কারণেই তারা নিজেদের মাঝে এই শ্রেণি-পার্থক্যের জন্ম দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তারা নিজেদের ঐক্য ও জাতীয়তায় বিভাজন তৈরি করেনি। ফলে কৃতিত্ব ও সফলতা অর্জনের দিক দিয়ে অন্য কোনো সম্প্রদায় কখনোই তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। আজকের আমেরিকা তো তারাই তৈরি করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসন ও ক্ষমতার লড়াই নিয়ে পুরো পৃথিবী যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন অসংখ্য মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমেরিকায় অভিবাসী হয়। আর এই সুযোগ লুফে নিয়ে ইহুদিরাও দলে দলে আমেরিকায় প্রবেশ করা শুরু করে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর যেখানে একমাত্র অবলম্বন ছিল মেধা ও পরিশ্রম, সেখানে তাদের অবলম্বন অঢেল অর্থ-সম্পদ। তারা জন্ম দেয় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার। শুরু হয় শ্রমবাজারের সাথে পুঁজিবাজারের দ্বন্দ্ব। নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুঁজিপতিরা কিনে নিতে থাকে সাধারণ মানুষের মেধা ও শ্রম।

একটা সময় ছিল- যখন তারা শুধু কৃষি কাজ করত। রোমান সম্রাট কর্তৃক জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল তাদের মূল পেশা। তাহলে কীভাবে তাদের আমূল পরিবর্তন হলো, আর কীভাবেই-বা উত্থান ঘটল?'

আসলে Formative Period (১০০০ BC-৫০০ AD)-এর বিশেষ একটি শাসনব্যবস্থা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক কাঠামো ন্যায়সংগত করতে পয়গম্বর মোজেস' 'Money aristocracy' আইনটির প্রচলন করেন। সুদ-বাণিজ্য এবং ঋণী ব্যক্তির জমি দখল করাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। তার আইনে চিরস্থায়ী আয়েশি জীবনের কোনো স্থান ছিল না। তিনি দখলদারদের হাত থেকে আত্মসাৎ হওয়া সকল জমি উদ্ধার করে জনসাধারণের মাঝে বণ্টন করেন। এ আইন ৫০ বছর স্থায়ী ছিল। যাকে বলা হয় 'The Year of Jubilee"!
কিন্তু এখন আইন মেনে চললে তো আর রাজকীয় সম্পদের মালিক হওয়া যাবে না। তাই মোজেস মারা যাওয়ায় কিছুদিন পর তারা আবারও সুদ-বাণিজ্যে ফিরে আসে। মূলম, মুনাফায় প্রশ্নে তারা কখনো আপস করতে রাজি ছিল না। তাই মোজোসের যেসব আইন অধিক মুনাফা অর্জনে প্রতিবন্ধক, সেগুলোর প্রতিটি তারা পালটে দেয়। 'Law of Suanger' নায়ে তারা

নতুন একটি আইন তৈরি করে। এ আইন অনুযায়ী অন্যান্য সম্প্রদায়দের সাথে ধাণিজ্য করার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হাতা। যেমন। একজন অপরিচিত জ্যান্টাইলের সাথে সুদ-বাণিজ্য করা যাবে, কিন্তু নিজ ধর্মের ভাইয়ের ওপর কখনোই সুদের বোঝা চাপালো যাবে না।

ইতিহাস বলে, ইজরাইল সব সময় একটি শাষকরাষ্ট্রে হতে চেয়েছে। তারা চেয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি রাজ্য তাদের কুর্নিশ করাবে এবং তারাই হবে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। জ্যাকব' থেকে শুরু করে সকল পয়গম্বর চেয়েছিলেন- ইজরাইল পৃথিবীর বুকে একটি ন্যায়পরায়ণ জাতি হিসেবে টিকে থাকবে।
আজ থেকে আনুমানিক ৩৯০০/৪০০০ বছর পূর্বে ইজরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্মান, নীলনদের পূর্বাঞ্চলীয় অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল ক্যানাইটদের রাজত্ব।

ক্যানাইটরা হলো নোয়াহের কনিষ্ঠ পুত্র হ্যামের বংশধর। নোয়াহ নাকি সৃষ্টিকর্তার সাথে সন্ধি করেছিলেন- তার বংশধররা কেবল তারই উপাসনা করবে এবং তার প্রণীত সকল আইনকানুন মেনে চলবে। কিন্তু সেই সন্তানেরা একসময় একেশ্বারবাদের কথা ভুলে গিয়ে পৌত্তলিকতায় মেতে ওঠে। তারা ঈশ্বরের আইন অগ্রাহ্য করে নিজেদের মতো আইন রচনা এবং বিভিন্ন ভাস্কর্যের উপাসনা করতে শুরু করে। যেমন: আনাথ যুদ্ধ-বিগ্রহের কুমারী দেবী, আখিরাত- সমুদ্র পরিভ্রমণকারী, আত্তার প্রভাতের দেবতা ইত্যাদি। তাদের এই পেগানবাদ তত দিনে ক্যানানসহ অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরও অনেক পাপকর্মের দরুন তারা একসময় সৃষ্টিকর্তার অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়।
অপরদিকে, পয়গম্বর আব্রাহামের বংশধরদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তাঁর পৌত্র জ্যাকবের অপর নাম ইসরাইল। এই নাম অনুযায়ী তাঁর ১২ পুত্র এবং তাদের বংশধরদের একত্রে বনি ইসরাইল বলা হয়। সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় ফেরাউনের রাজত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসার পর তাদের নিকট ঐশী বাণী আসে, তারা যেন ক্যানাইটদের সেখান থেকে বের করে দেয়।

কিন্তু তারা এই নির্দেশ অমান্য করে। তারা এই অভিশপ্ত জাতির সম্পদ ও প্রাচুর্যের মোহে পড়ে যায়। এমন একটি জাতিকে নির্বাসিত করে তারা সম্পদের মহাসমুদ্র হাতছাড়া করতে চায়নি। অবাধ্যতার সূচনা এখান থেকে শুরু। ধীরে ধীরে তারা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বস্তুবাদী বিশ্বাসে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বর্গীয় নির্দেশ অমান্য করার দরুন তাদের ওপর যে শাস্তি

নেমে আসে, তা বহুকাল বয়ে বেড়াতে হয়। অনেকের ধারণা- এই ক্যানাইটরাই আজকের ইহুদিদের সকল ক্ষমতা ও প্রাচুর্যতার মূল কারণ।

যাযাবর হলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রদূত হিসেবে তারা যে পুরো পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে। প্রবাদে আছে:

'ইজরাইল অনেকটা আঙুর গাছের মতো। তার শাখা-প্রশাখা যতই কাটা হোক না কেন, তা আবারও গজাবে। কারণ, তার শেকড় রয়েছে আছে মাটির অনেক গভীরে।'

আজকের যে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, তার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। জার্মান ইহুদি পরিবার রথসচাইল্ড হলো এই শিল্পের কান্ডারি। ইংল্যান্ড, ইটালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াসহ আরও অনেক দেশে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যখনই কোনো রাজার অর্থের প্রয়োজন হতো, তারা এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরবরাহ করত। আবার যদি কোনো রাজা মূল্যবান সম্পদ (স্বর্ণ, রৌপ্য, কপার ইত্যাদি) ব্যবহার না করে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে চাইত, তবে ব্যাংকারগণ চেকের মতো ছোট্ট একটি কাগজের টুকরো স্বাক্ষর করে সেই দেশের শাখায় পাঠিয়ে দিত। এই কাগজের টুকরো আজকের দিনে ব্যাংক চেক-এ রূপ নিয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম যে সামরিক বহিনী গঠিত হয়, তাতেও ছিল ইহুদিদের মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ।

বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক অফিস স্থাপনের ধারণা সর্বপ্রথম তাদের মাথা থেকেই উদ্ভাবিত হয়। ফলে ইউরোপের দেশগুলোতে যখন নতুন কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা দেখা দিত, প্রথম তারাই সে খবর পেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'Peaceful Penetration' নামে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার দরুন আমেরিকার বাজার জার্মানদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এতে করে সে দেশের সাধারণ জনগণ লাভবান হয়েছে তা নয়। কারণ, পুরো ঘটনার আড়ালে ছিল সেখানকার ইহুদিরা। তারা জার্মানির নাগরিকত্বকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আমেরিকায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। সিন্ডিকেট উপায়ে প্রতিটি শিল্পের ওপর থাবা বসাতে শুরু করে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী নিরূপায় হয়ে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে আমেরিকা জার্মানি হতে প্রচুর তুলা আমদানি করে। আরও অনেক তুলা রপ্তানির জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর তা আর রপ্তানি করা সম্ভব হয়নি। মালিক সমিতি এত তুলা নিয়ে কী করবে? সব তো নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে তারা বাধ্য হয়

তুলা নিলামে ওঠাতে। এ সময় লন্ডনে থাকা ইহুদিরা সেই পাহাড় পরিমাণ তুলা নিলামের ভিত্তিতে কিনে নেয়। তারা যে মূল্যে তুলা ক্রয় করে, তা ছিল আমেরিকান বাজারমূল্য থেকে অনেক কম। এর উদ্দেশ্য ছিল বাজারে তুলার দাম কমিয়ে আনা। ফলাফল তাই হলো। রাতারাতি তুলার দাম কমতে শুরু করে। এই সুযোগে তারা আরও অনেক তুলা কিনে বাজারকে তুলাশূন্য করে। বাজার খালি হওয়ার পর তারাই আবার তুলার দাম বাড়াতে শুরু করে। কারণ, বাজারে তুলার ছিটেফোঁটা পর্যন্ত ছিল না। তারা প্রচার করে- বাজারে তুলার খুবই অভাব, তাই তুলাজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে বিশ্বযুদ্ধে তারা প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে যায়।বিশ্ব অর্থব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপট কতটা কঠিন রূপ নিয়েছে, তা সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। নির্দয় পুঁজিবাজার কখনো শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে পারেনি। শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহলগুলো সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। পুঁজিকে কুক্ষিগত করে স্বার্থান্বেষী মহল কুলি-মজুরদের পারিশ্রমিক পানির দরে নামিয়ে এনেছে। পুঁজিবাজার হলো শ্রমবাজারের ছাদস্বরূপ, কিন্তু এই দ্বাদ কখনো শ্রমজীবী মানুষের নিরাপদ আশ্রয় হতে পারেনি।

পুঁজি বলতে আমরা মূলত অর্থকে বুঝি, যা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। আমরা ভুলবশত উৎপাদক গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক ম্যানেজার ও চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাদ বলে থাকি। কিন্তু কীভাবে তাদের পুঁজিবাদ বলব, যখন তাদের ব্যবসায়িক পুঁজির জোগানদাতা অন্য কোনো বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী। মূলত এই বিনিয়োগকারীদের চাপে পড়ে উৎপাদক, ম্যানেজার এবং চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বভাবগত ভালো রূপ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পায়ের নিচে মাটি ধরে রাখতে এবং বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ মেটাতে তারা শ্রমবাজারের ওপর কঠিন রূপ ধারণ করে। ফলে পুঁজিবাজার ও শ্রমবাজারের মধ্যে সব সময় বিরোধ লেগে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ কখনোই সম্ভব নয়। যতদিন না বিশ্ব অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এই স্বার্থান্বেষী মহলের থেকে ছিনিয়ে আনা যাবে।

আজ পুরো পৃথিবী এমন কয়েকটি ভয়ংকর মতবাদে পরিচালিত হচ্ছে, যার অধিকাংশই আমাদের অজানা। যেমন: 'সুপার ক্যাপিটালিজম'- যেখানে বলা হয় 'স্বর্ণই প্রকৃত সম্পদ'। 'সুপার গভর্নমেন্ট' একটি পৃথক ও স্বাধীন সরকারব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠা করা। যতদিন না এই ভয়ংকর মতবাদ দুটোর অবসান ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত পুঁজিবাজার ও শ্রমবাজারের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে।

আমেরিকা আবিষ্কার

ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, আমেরিকা আবিষ্কার করেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তবে এটা শেখায়নি, তিনি কাদের সহযোগিতায় এ দেশের সন্ধান পান।

আজ অবধি যে সকল ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযান মানুষকে নতুন সব জ্ঞান ও প্রাচুর্যতা এনে দিয়েছে, তার অর্ধেক সম্ভব হয়েছে কেবল ইহুদিদের জন্য। যাযাবর জাতি হওয়ায় ইহুদিদের একটি বিশেষ সুবিধা হলো- পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কোথায় কী আছে, 'তা তারা খুব ভালো করেই জানে। তা ছাড়া সমুদ্রযাত্রায় মানুষ যেসব যন্ত্রপাতি বহুকাল ধরে ব্যবহার করেছে, তার অধিকাংশই ইহুনিদের আবিষ্কার। যেমন। ম্যাপ, কম্পাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। এ কারণে সমুদ্র অভিযান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাদের মতো দক্ষতা আর কোনো জাতির ছিল না।সমাজের বহু মানুষের আবেগ-অনুভূতি। কিন্তু যদি কোনো সম্প্রদায় নিজ ধর্মকে পুঁজি কবে সন্ত্রাসবাদ কায়েম করে এবং ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন কি তাদের ধর্মীয় পরিচয় লুকিয়ে রাখার আর কোনো উপায় থাকে
?
পৃথিবীতে এখনও যে বহু সৎ ও আদর্শবান ইহুদি বেঁচে আছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিছু নৈতিকতা সব ধর্মেই পাওয়া যায়। এমন যদি হতো, বিশ্ববাসীরা সকল সমস্যার সমাধান শুধু এই ধর্মটিতে খুঁজে পাচ্ছে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হতে পারত, কিন্তু সেখানেও তারা ব্যর্থ।

ইহুদিরা নিজেদের ধার্মিক বলে দাবি করলেও তাদের সম্পদশালীদের ধর্মীয় অনুশাসনের খারের কাছেও দেখা যায় না। তাদের মধ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের ছিটেফোঁটাও নেই। যারা কঠিন দরিদ্রতায় দিন পার করছে, কেবল তাদেরই প্রকৃত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে দেখা যায়। বেচা-বিক্রি কম হবে তা জেনেও সাব্বাতের" দিনে দোকান বন্ধ রাখে এবং ইওম কিপুর দিনটিতে রোজা রাখে। ধর্মীয় চেতনা এই পরিষদের কখনো ক্ষমতার গদি এনে দিতে পারেনি। মূলত সঠিকভাবে নিজ ধর্ম পালন, আর ধর্মকে পুঁজি করে ব্যাবসা ও সন্ত্রাসবাদ কায়েম কখনো এক বিষয় নয়।

প্রকৃতিকভাবেই তাদের প্রতিটি প্রজন্ম এমন কিছু গুণ পেয়ে থাকে, যা জ্যান্টাইলদের মাঝে সাধারণত দেখা যায় না। তাদের সবার মাঝেই কমবেশি এই গুণগুলো উপস্থিত থাকে। এ জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্য পাঠকদের জানা উচিত বলে মনে করি। যেমন।

১. ব্যাবসা-বাণিজ্যে ইহুদিদের মতো প্রতিভাধর জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। এর রহস্য কেবল সৃষ্টিকর্তাই জানেন, কেন তিনি তাদের এভাবে সৃষ্টি করেছেন।

২. ইহুদিদের মতো সূক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই এসেছে। ব্যাবসা- বাণিজ্যে অসামান্য দক্ষতা অন্যদের চক্ষুশুলে পরিণত করেছে। অনেক সম্প্রদায় তো তাদের সাথে বাণিজ্য করতেই অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এমনকী বহুবার তাদের একঘরে করে রাখা হয়েছিল। তবে ইহুদিদের রাজনৈতিক পরিকল্পনাগুলো এতটাই বিস্ময়কর ছিল, বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহরা পর্যন্ত তাদের অভ্যর্থনা না জানিয়ে পারত না।

৩. ইহুদিরা অসংখ্য মতবাদের জন্মদাতা। একটি সমাজকে বহু অংশে বিভক্ত করার সহজ উপায় হচ্ছে তাদের মাথায় নতুন নতুন মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া।

(Book:সিক্রেটস অফ জায়োনিজম)

হিন্দু সম্প্রদায়,পরিচিতি, অপতৎপরতা

হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ

হিন্দু বলে যারা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় তারা বহু ভাগে বিভক্ত। তাদের আকিদা বিশ্বাস ও ভিন্ন, নিম্নে কয়েকটি গ্রুপের নাম ও আকীদাসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। যেমন-

১. ব্রাহ্ম কুমারী

তারা শিব লিঙ্গের পূজা করে না, বেদকে মানে না। তাদের প্রধান ধর্মনেতা হয় মহিলা। তাকে বেহেন্দ্রী বলে সম্বোধন করা হয়। তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রথমে (সালাম) দেয়, ডান হাতের আঙুলের মাথাগুলি গুটিয়ে নতশীরে বলে 'ওম শান্তি' অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রতি উত্তরেও ওঁম শান্তি বলা হয়। তারা নিজেদের ধর্মের প্রচার করে। যা সনাতন বা অন্য কেউ করে না। তাদের ধর্ম গ্রহণ করলে চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকতে হয়। বিবাহিত হলে বিবাহ বন্ধন ছেদ করতে হয়। তাদের মূল উপাসনা হলো ধ্যান (মুরাকাবা)। এই গ্রুপটির অস্তিত্ব বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। ইন্ডিয়াতে তাদের ভালো প্রচলন আছে। তাদের প্রধান কার্যালয় হলো উত্তর প্রদেশের রামপুরা এস্টেটে।

২. নেরংকারী

তারা কোন স্বাকারের পূজা করে না নিরাকার এক মালিককে মানে। তবে অবতারদের স্বীকার করে। এই গ্রুপটিও ভারতে বেশী দেখা যায়।

৩. ইসকন

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন) বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ একটি হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৬ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসকনের মূল ধর্মবিশ্বাসটি শ্রীমদ্ভাগবতসও ভগবতগীতা গ্রন্থদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই সংগঠন গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের অনুগামী। উক্ত মতটি খ্রিষ্টীয়পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়এবং ১৯৩০-

এর দশক থেকে পাশ্চাত্য সমাজে ধর্মান্তরণের কাজ শুরু করে। ইসকন একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। ভক্তিযোগ এই সংগঠনের মূল উপজীব্য। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণকে তুষ্ট করাই এই প্রতিষ্ঠানের ভক্তদের জীবনের মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। মস্কো, রাশিয়ায়অনুষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব ইসকন বৃন্দাবন

২০০৯ সালের হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসকনের ৬৫০টিরও বেশি মন্দির এবং কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি খামার সংগঠন (কয়েকটি স্বনিযুক্তি প্রকল্প সহ), ৫৪টি বিদ্যালয়ও ৯০টি ভোজনালয়। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপে (সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর) ও ভারতে এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ইসকন সম্পর্কে ইনকিলাবের এক স্টাফরিপোর্টে কিছু তথ্য দেওয়া হয়ে ছিল। প্রতিবেদনটি প্রকাশ হয়ে ছিল ৩ জুলাই, ২০১৭ ইং তারিখে। পাঠকের সুবিধার্থে এখানে সেই তথ্যটি নিম্নে পেশ করছি।

ইসকন সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন সংগঠন নয়। এটা হিন্দু বেশধারী একটি ইহুদী সংগঠন। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা, বাংলাদেশে 'র' বইয়ের ১৭১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "ইসকনের সদর দপ্তর ভারতের নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানীমূলক হিন্দুদের অনুষ্ঠান পালন করা, উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি। ইসকনের প্রতিষ্ঠা ভারতে নয়, ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন অভয়চরণাবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। তিনি ভারতের কোন হিন্দু শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করেননি। তিনি লেখাপড়া করেন নিউইয়র্কে খ্রিস্টান চার্চে। পেশায় তিনি ছিলেন ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ী। ভারতে তার ইসকন সংগঠনকে প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রথমেই বাধা দিয়েছিলো, ভারতের সনাতন হিন্দুরা (যারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে)। ভারতে ইসকন প্রতিষ্ঠাকালে সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের বাধার সময় স্বামী প্রভুপাদের পক্ষে কাজ করেছিলো জে. স্টিলসন জুডা, হারভে কক্স, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মত চিহ্নিত ইহুদী- খ্রিস্টান এজেন্টরা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসকন একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন। এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য মধ্যযুগের শ্রী চৈতন্য থেকে আগত। চৈতন্যের অন্যতম থিওরী বা নীতি হচ্ছো- "নির্যবন করো আজি সকল ভুবন"। যার অর্থ সারা পৃথিবীকে যবন মানে মুসলমান মুক্ত করো। (বাংলা

দেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ), পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬২)। উল্লেখ্য, ইসকন শিব দেবতাকে দেখতেই পারে না। ইসকনের বই পত্রে আত্মা, পরকাল, পুনজন্ম নিয়ে একটি আলাদা ধারণা দেয়া হয়েছে যেটা সনাতন ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন ইসকনিদের মতে যেসব হিন্দু কালী ভক্ত বা লোকনাথ ভক্ত তারা কোনদিন ও স্বর্গে যেতে পারবে না। তারা বারবার কেবল পুনজন্ম নিবে। বাংলাদেশে অনলাইন অফলাইন উভয় প্লাটফর্মে হিন্দু মুসলিম বিভেদ বা সাম্প্রদায়িক উসকানির হোতা হচ্ছে ইসকন। এটা প্রমাণ করে যে ইসরায়েলী ইহুদীদের টাকায় পরিচালিত সংগঠন ইসকনের মূল কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে দাঙ্গা সৃষ্টি করা। উগ্র সংগঠন ইসকন কর্তৃক বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে দাঙ্গা লাগানোর নমুনা হচ্ছে, বাংলাদেশে সনাতন মন্দিরগুলো দখল করা এবং সনাতনদের তাড়িয়ে দেয়া। যেমন স্বামীবাগের মন্দিরটি আগে সনাতনদের ছিলো, পরে ইসকনরা কেড়ে সনাতনদের ভাগিয়ে দেয়। এছাড়া পঞ্চগড়েও সনাতনদের এলাকা ছাড়া করে ইসকনরা। ঠাকুরগাঁও-এ সংঘর্ষ বাধিয়ে সনাতন হিন্দুকে হত্যা করে মন্দির দখল করে ইসকন। এছাড়া গতবছর সিলেটের জগন্নাথপুরে সনাতনদের রথযাত্রায় হামলা চালিয়েছে ইসকন।

এছাড়া বাংলাদেশে মসজিদে সাম্প্রদায়িক হামলা করা এদের অন্যতম লক্ষ্য। দুই বছর পূর্বে ঢাকাস্থ স্বামীবাগে মসজিদে তারাবীর নামাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো ইসকন। নামাজের সময় ইসকনের গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বলায় তারা পুলিশ ডেকে এনে তারাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে বিষয়টি নিয়ে সংঘর্ষ হয়। সিলেটেও গত বছর অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিলো সিলেট শহরের ইসকন মন্দিরের কাছে কাজল শাহ এলাকার একটি জামে মসজিদে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, এছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন। যেমন- জাতীয় হিন্দু মহাজোট, জাগো হিন্দু, বেদান্ত, ইত্যাদি তৈরী করে ইসকনের উগ্রহিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি ঘটানো। বর্তমান অনলাইন জগতে যেসব ধর্ম অবমাননা করা হচ্ছে তার অধিকাংশই ইসকন সদস্যদের অপকর্ম।

সিলেটে রাগীব রাবেয়া মেডিক্যালে কলেজ ইস্যুর পেছনে রয়েছে ইসকন। ইসকন আড়াল থেকে পুরো ঘটনা পরিচালনা করে এবং পঙ্কজগুপ্তকে লেলিয়ে দেয়। পঙ্কজগুপ্ত জমি পাওয়ার পর সেই জমি নিজেদের দখলে নিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইসকন। বর্তমানে বিচারবিভাগে ইসকনের প্রভাব মারাত্মক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ খোদ প্রধান বিচারপতিও একজন ইসকন সদস্য।(২

২০১২ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে সনাতনী মন্দির দখল করে নেয়ায় ইসকনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছিলো। (৩

২০১৫ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ছনহরা এলাকায় বর্তমান ইসকন পরিচালিত বাসুদেব মুকুন্দ ধাম মন্দির দখল করার জন্য পার্শ্ববর্তী সুজন শেখর দত্তের মাধ্যমে হামলা করে এ মন্দির দখল করেছে।(৪)

তাই বাংলাদেশে যদি এখনই ইসকনকে নিষিদ্ধ না করা হয়, তবে বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে, যেই অপেক্ষায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা হারালেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।৫
তারা সাধু টাইপের তারা নিরামিষ ছাড়া অন্য কিছু খাবার খায় না। তারা জীব হত্যাকে মহাপাপ মনে করে। এরা হলো সনাতন ধর্মের সংস্কারবাদী একটি দল। তারা ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে নিয়ে সামাজিক অনেক কিছুর সংস্কার করেছে। সনাতন ধর্মের অনেক আকীদা-বিশ্বাস ও রুসম রেওয়াজকে কুসংস্কার বলে আখ্যা দিয়েছে। তাদের সাধনাও হয় খুবই কঠিন। যেমন ভোরে উঠে গোসল করতে হয়, সৌচকার্য থেকে পবিত্র হতে হলে গোসল করতে হয়। নিরামিষ ছাড়া কিছু খায় না। তাদেরকে চেনার উপাই হলো, সাধারণত তারাই মাথায় টিকি রাখবে। হলুদ ও গেরুওয়া রঙ্গের পোশাক পরিধান করে। হাতে থাকে একটি থলে, তাতে থাকে ১০০০ দানা বিশিষ্ট একটি মালা। সেই দানাগুলো গুনে মন্ত্র যপে। মন্ত্রটি হলো, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" (৬)

এরা ধর্ম নিয়ে যথেষ্ট লেখাপড়া করে। যা হিন্দুদের মধ্যে অন্য কোন দলকরে না। তাদের রচিত অনেক বই বাজারে পাওয়া যায়। তাদের নিজেস্ব প্রকাশনাও আছে। তারা নিজেদেরকে সনাতন বলেই দাবি করে।

৪. সনাতন

আমাদের দেশে যাদের আমরা হিন্দু বলে মনে করি- তারা অধিকাংশই সনাতন। তারা বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করে। সনাতম ধর্মের আরেকটি নাম হলো বৈদিক ধর্ম। সনাতন অর্থ পুরাতন। যুগযুগ থেকে যেহতু এই ধর্ম চলে আসছে তাই তাকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে ইসলামই হলো সনাতন ধর্ম। কারণ পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ আদম আ. মুসলমান ছিলেন, তাঁর ধর্ম ছিল ইসলাম। এর পরও যত নবী রাসূল এসেছেন তারাও মুসলমান ছিলেন। তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। তাই ইসলাম হলো প্রকৃত সনাতন ধর্ম।

১.সূত্র-http://goo.gl/XwkLvm;http://goo.gl/7hegYE

২. সূত্র: http://goo.gl/g3w0KK

৩.সূত্র: http://archive.is/JbP92

৪. সূত্র:http://archive.is/svfYW

৫.দৈনিক ইনকিলাব, ৩ জুলাই, ২০১৭

৬.শ্রীমদ্ভগতব গীতা যথাযহ পৃ. ৬

রোম সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ

স্বয়ং ধর্ম নিয়েই কালাম শাস্ত্রীয় বাহাছ তথা তর্ক-বিতর্কের ঝড় শুরু হয়ে যায় এবং নিষ্ফল মতানৈক্য ও বৈষম্যের হাঙ্গামা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে জড়িয়ে ফেলে। এই দ্বন্দ্বে তাদের মেধা ও প্রতিভার অপচয় ঘটে এবং তাদের কর্মশক্তি স্থবির হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ঘরোয়া বিবাদই বিরাট আকারের রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ নেয়। শিক্ষাঙ্গন, গির্জা ও মানুষের বাড়ি ঘর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হয় এবং গোটা দেশই হয়ে পড়ে গৃহযুদ্ধের শিকার। তাদের বিতর্কের বিষয় ছিল এই যে, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) এর ফিতরাত তথা প্রকৃতি কি এবং এর মধ্যে খোদায়ী ও মানবীয় অংশের আনুপাতিক হার কত? রোম ও সিরিয়ার মালকানী (Malkite) খ্রিষ্টানদের আকিদা ছিল এই, হযরত মাসীহ (আ.) এর প্রকৃতি হলো মিশ্রিত। তন্মধ্যে একটি অংশ হলো খোদায়ী এবং আরেকটি অংশ হলো মানবীয়।কিন্তু মিসরের মনোফিসীয় (Monophysites) খ্রিষ্টানদের জিদ ছিল, মাসীহ (আ.)-র প্রকৃতি নির্ভেজাল খোদায়ী। এর মধ্যে তাঁর মানবীয় প্রকৃতি এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যেভাবে সির্কার একটি ফোটা সমুদ্রে পতিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রথমোক্ত মত ছিল সরকারী মত। বায়যান্টাইন সম্রাটরা ও শাসক মহল একে ব্যাপকতর করতে এবং গোটা সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্মে পরিণত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং এ মতের বিরোধীদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেয় যা ভাবতে গেলেও লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মতানৈক্য ও ধর্মীয় সংঘাত-সংঘর্ষ বেড়েই চলে। উভয় দল একে অপরকে এমন ধর্ম বহির্ভূত ও বেদ্বীন মনে করত, দেখে মনে হতো, এরা বুঝি বা পরস্পর বিরোধী দুই স্বতন্ত্র ধর্মের অনুসারী।

১৩. Alfred J. Butler, Arabs conquest of Egypt and last thirty years of the Roman Dominion (Egypt: E World Inc, 1992), p. 29-30

সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অরাজকতা

রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। রাজ্যের প্রজা সাধারণগণ অসংখ্য বিপদের শিকার হওয়া সত্ত্বেও গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত তাদের উপর দ্বিগুণ-চতুর্গুণ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ছিল সরকারের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট ও এ ধরনের সীমাহীন যুলুম-নিপীড়নের দরুন তারা স্বদেশী শাসনের মুকাবিলায় বিদেশী শাসনকেই অগ্রাধিকার দিত। ইজারাদারী (Monopolies) ও জোর-যবরদস্তিপূর্বক ধন-সম্পদ ছিনতাই ছিল যেন বোঝার উপর শাকের আটি। এ সমস্ত কারণে বিরাট আকারে বিক্ষোভ ও হৈ-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের হাঙ্গামায় একমাত্র রাজধানীতেই ত্রিশ হাজার মানুষের জীবনাবসান ঘটে। ১*

তখনকার সময় ও সুযোগের দাবি ছিল ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ। কিন্তু লোকে অপচয়-অপব্যয়ে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনক্রমেই তা থেকে বিরত হতে রাজি হচ্ছিল না। তারা নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত ধাপে উপনীত হয়েছিল। সবার মধ্যে কেবল একটা ধান্ধাই বিরাজ করছিল এবং সকলকে একই ভূতে পেয়ে বসেছিল যেনতেন প্রকারে সম্পদ আহরণ করতে হবে এবং সেই সম্পদ নিত্যনতুন ফ্যাশন, আরাম- আয়েশ ও ভোগবিলাস এবং আপন প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার পিছনে ব্যয় করতে হবে। মানবতা, ভদ্রতা ও সৌজন্যের ভিত্তি স্থান থেকে সরে গিয়েছিল। সভ্যতা ও নৈতিকতা বিদায় নিয়েছিল। পরিস্থিতি এত দূর গড়িয়েছিল যে, লোকে পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের উপর চিরকুমার জীবনকে প্রাধান্য দিত যাতে সে স্বাধীন ও বল্গাহীন জীবন যাপনের সুযোগ পায়।২*

ন্যায় ও সুবিচারের অবস্থা ছিল এই, সেল-এর ভাষায়, যেভাবে বিবিধ দ্রব্য ও বস্তুসামগ্রী বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে এবং সে সবের মূল্য নির্ণীত ও নির্ধারিত হয় ঠিক সেভাবেই অন্যায় ও আত্মসাতকে স্বয়ং জাতির পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হতো। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে ছিল। এর উদাহরণ হলো শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত সেই ফলবান বৃক্ষ যার ছায়াতলে পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠী এককালে আশ্রয় নিত। আর এখন সেই বৃক্ষের কেবল কাণ্ডটাই দাঁড়িয়ে আছে এবং শুকোতে শুকোতে শেষ দশায় এসে পৌছেছে। ৩*

১. Justin Bieber, Britannica Online for Kids (http: kids.britannica.com/eb/art- 151049, 6 Aug, 2016), p. 122

২.*Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (W. Strahan and T, 3rd edition, Cadel. 1776), p. 327*

The Life of Muhammad, Arabia Before Islam (Sale's Translation), Ibid, p.62

৩. *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Ibid, p. 327*

Historian's History of the world-এর লেখক বলেন, That it (Byzantine Empire) had nevertheless suffered very severely in the general decline caused by over taxation, and by reduced commerce, neglected agriculture and diminished population. is attested by the magnificent rules of cities which had already fallen to decay, and which never regained their ancient prosperity.

অর্থাৎ, "বড় বড় শহরে দ্রুততার সাথে ধ্বংস ও অধঃপতন নেমে এল। এরপর যেসব শহর সেই ধ্বংসের ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি, তাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। সেগুলো সাক্ষ্য দেয়, বাইজান্টাইন হুকুমত সে সময় চরম অধঃপতিত অবস্থায় ছিল আর এই অধঃপতন অতিরিক্ত করের চাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা, কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতা ও উদাসিনতা এবং শহরগুলোতে জনসংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের ফলেই ঘটেছিল। "১

ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমের জাতিগোষ্ঠী

সব পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠী যারা উত্তর ও পশ্চিমে বসবাস করত তারা ছিল অজ্ঞতা ও মূর্খতার শিকার, ছিল রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-হানাহানিতে ক্ষতবিক্ষত। তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও অজ্ঞতা-মূর্খতা থেকে সৃষ্ট ঘোর অন্ধকারে হাত-পা ছুড়ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা দ্বারা আলোকিত করে তুলতে তখনো ও সব দেশের ভাগ্যাকাশে মুসলিম স্পেনের অভ্যুদয় ঘটেনি। তাছাড়া বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকও তাদের চোখ খুলতে সাহায্য করেনি। মোটকথা, এসব জাতিগোষ্ঠী মানব সভ্যতার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আকীদা- বিশ্বাসের দিক দিয়ে এসব জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল নবীন অভিজ্ঞতাহীন খ্রিষ্ট ধর্ম ও প্রাচীন মূর্তি পূজার মাঝামাঝি।

এইচ. জি. ওয়েলস (H. G wells) বলেন, তাদের কাছে না দ্বীনের কোন পয়গাম আর না রাজনীতির ময়দানে তাদের কোন উচ্চ আসন ছিল। তৎকালে পশ্চিম ইউরোপে ঐক্য- সংহতি ও আইন-শৃঙ্খলার কোন চিহ্ন মাত্র ছিল না।২

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, From the fifth to the earth century Europe lay sunk in a night of barbarism which grew darker and darker. It was a barbarism far more awful and horrible than that of the primitive savage, for it was the decomposing body of what had once been a great civilization. The features and impress of that civilization were all but completely effaced. Where its development had been fullest, e.g., in Italy and Gaul, all was ruin, squalor, dissolution

১. J.M. Roberts, History of the World (The United States: The Amazon Review, 1907), Vol. vii- p. 175

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

অর্থাৎ, "খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিয়ে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে গভীর অন্ধকার ছেয়ে ছিল এবং তা ক্রমশ অধিক গভীর ও ভয়াবহ হয়েই চলছিল। তখনকার ভয়-ভীতি ও বর্বরতা ছিল প্রাচীনকালের ভয়-ভীতি ও বর্বরতার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। কেননা এর

উদারতা ছিল এক বিরাট সভ্যতার লাশের যে লাশ পচে ও গলে গিয়েছিল। সেই সভ্যতার চিহ্নাদি লোপ পাচ্ছিল এবং তার উপর ধ্বংসের মোহর লেগেছিল। সে সমস্ত দেশ যেখানে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল যেমন ইটালী, ফ্রান্স, সেখানে ধ্বংসের তাণ্ডব, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলারই রাজত্ব চলছিল। "

. Robert Brifoult, The Making of Humanity (New York: The Modern Library, 1931), p. 164

ইয়াহুদী জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারী ইয়াহুদী নামক জাতিগোষ্ঠী দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর ভিতর এদিক দিয়েও অনন্য ছিল, তাদের নিকট দ্বীন (ধর্ম) এর এক বিরাট বড় পুজি ছিল এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যখ্যা বিশ্লেষণ ও পরিভাষা সমূহ অনুধাবনের সর্বাধিক যোগ্যতা ছিল কিন্তু এই ইয়াহুদীরা ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই মর্যাদার অধিকারী ছিল না যাতে তারা অন্যদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, বরং অন্যরা তাদেরকে শাসন করবে, সর্বদা তারা অন্যের যুলুম-নিপীড়ন সইবে নানা রকম শাস্তি ও নির্যাতন ভোগ করবে, বিবিধ প্রকারে কঠোরতা ও ভয়-ভীতির শিকার হবে, এটাই ছিল তাদের ভাগ্যলিপি। দীর্ঘকাল ধরেই গোলামির জীবন যাপন এবং নানা ধরনের কঠোরতা ও শাস্তি ভোগের দরুন তাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, জাতিগত অহমিকা, গোত্রীয় ও বংশগত অহংকার, ধন-সম্পদের প্রতি সীমাতিরিক্ত লোভ- লালসা, অব্যাহত সুদী কারবারের দরুন বিশেষ ধরনের চরিত্র ও মানসিকতা, জাতিগত অভ্যাস ও স্বভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে তাদের কোন জুড়ি ছিল না।

দুর্বল ও বিজিত অবস্থায় লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়া ও বিজয়ী জাতিকে খোসামোদ-তোষামোদ করা আর বিজয়ী হতেই বিজিত জাতির সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ এবং সাধারণ অবস্থায় প্রতারণা, শঠতা, মুনাফেকী, সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ও স্বার্থপরতা, বিনা পয়সায় অপরের শ্রমের ফসল ভোগ, হারামখোরি, সত্যের পথে লোকদের বাধা প্রদান তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুর'আনুল কারিম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তাদের এ অবস্থার খুবই খোলাখুলি ও পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছে এবং বলেছে, নৈতিক অবনতি, মানবিক অধঃপতন ও সামাজিক অনাচার-অরাজকতার মধ্যে তারা কোন স্তরে অবস্থান করেছিল এবং কোন ও কী কারণে তারা চিরদিনের জন্য বিশ্বের নেতৃত্ব ও পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার হারাল।

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান দ্বন্দ

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে, এদের এক পক্ষ অপর পক্ষকে লাঞ্চিত, অপমানিত ও হেনস্থা করতে, প্রতিপক্ষ থেকে আপন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিশোধ নিতে ও বিজিত পক্ষের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করতে কোন রকম কসুর করত না। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহুদীরা এন্টিয়কে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সম্রাট ফোকাস এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে বিখ্যাত সমর অধিনায়ক বোনোসূস (Bonosus) কে প্রেরণ করেন। তিনি গোঁটা ইয়াহুদী বসতিকে এইভাবে উচ্ছেদ করেন যে, হাজার হাজার ইয়াহুদীকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করে, শত শত লোককে নদীবক্ষে ডুবিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে এবং আরো বহু লোককে হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষেপ করে শেষ করেন।

৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানিরা যখন শামদেশ জয় করে তখন ইয়াহুদীদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় সম্রাট খসরু খ্রিষ্টানদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালান ও অধিকাংশ খ্রিষ্টানকে হত্যা করেন। ইরানীদের ওপর বিজয় লাভের পর সম্রাট হেরাক্লিয়াস আহত ও নিপীড়িত খ্রিষ্টানদের পরামর্শে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহুদীদের থেকে ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে এমনভাবে কচুকাটা করেন যে, গোটা রোমক সাম্রাজ্যে কেবল সেই সব ইয়াহুদীই প্রাণরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল যারা দেশ থেকে পালাতে কিংবা কোথাও আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিল।২১

২১. *Alfred J. Butler. The Arabs Conquest of Egypt and the last thirty years of the Roman Dominion (New York: Oxford University press, Second Edition 1978). Pp. 133-34*

ইরান ও সেখানকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলনসমূহ

সভ্য দুনিয়ার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ব্যাপারে ইরান ছিল রোম সামাজের অংশীদার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ছিল মানবতার শত্রুগোষ্ঠীর তৎপরতার পুরনো লীলাভূমি। সেখানে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি বহুকাল থেকেই নড়বড়ে অবস্থায় চলে আসছিল। যে সব আত্মীয়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে পৃথিবীর সভ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাগণ সর্বদাই অননুমোদিত ও বেআইনী মনে করে এসেছে এবং প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণা করে থাকে-ইরানিরা সেসব সম্পর্ককে ঘৃণা ও অবৈধ বলে স্বীকার করত না। সম্রাট ২য় ইয়াযদাগিদ, যিনি ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজত্ব করেছিলেন, আপন কন্যাকে বিবাহ করেন, অতঃপর তাকে হত্যা করেন।

J.M. Roberts, History of the World (The United States: The Amazon Book Review, 1907), Vol. vii- p. 175

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শাসক বাহরাম চুবীন আপন বোনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিন্সেন এর বর্ণনা মোতাবেক ইরানে এ জাতীয় সম্পর্ককে কোন রকম অবৈধ কাজ বলে মনে করা হতো না, বরং একে ইবাদত ও পূণ্য কর্ম মনে করা হতো। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্গ বর্ণনা করেন, ইরানী আইনে ও সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন প্রকার সম্পর্কের বাচ-বিচার ছিল না।

.

আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী, তাফসীরে তাবারী শরীফ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), খ. ৩. পৃ. ১৩৮

খ্রি. ৩য় শতাব্দীতে দুনিয়ার বুকে মানীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আন্দোলন ছিল বস্তুতপক্ষে দেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র যৌনপ্রবণতার বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক ও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং আলো ও আঁধারের মনগড়া দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিস্বরূপ। অনন্তর মানী চিরকুমার জীবন অবলম্বনের আহবান জানান যাতে দুনিয়া থেকে মন্দ ও অন্যায় অনাচারের জীবাণু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি এই দার্শনিক ঘোষণা দিয়েছিলেন, আলো ও আধারের মিশ্রণই যাবতীয় অনাসৃষ্টির কারণ। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। এই ভিত্তিতে তিনি বিবাহকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, যাতে করে মানুষ যথাসত্তর নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এভাবে মানব জাতির অবলুপ্তির মাধ্যমে আলো অন্ধকারের ওপর চিরস্থায়ী বিজয় লাভ করেন। বাহরাম ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মানীকে এই বলে হত্যা করেন, এই লোকটির বিশ্বের ধ্বংসের আহবান জানাচ্ছে। এই জন্য

দুনিয়া খতম হওয়ার আগে এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পূর্বে তার নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু মানী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নিহত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রচারিত শিক্ষা বহুদিন যাবত বেঁচে ছিল এবং মুসলিম বিজয়ের পরেও এর প্রভাব অবশিষ্ট ছিল।

ইরানের সম্রাটপূজা

ইরানের রাজা-বাদশাহগণ, যাদের উপাধি ছিল কিসরা, দাবি করত, তাদের শিরা-উপশিরায় খোদায়ী রক্ত প্রবাহিত। ইরানের জনগণ ও তাদেরকে সেই নযরেই দেখত যেন তাদের সম্রাট তাদের খোদা। তাদের বিশ্বাস ছিল, তাদের ঐসব সম্রাটের প্রকৃতিতে একটি পবিত্র আসমানী বস্তু রয়েছে। অনন্তর এসব লোক তাদের সম্রাটকে সিজদা করত এবং তাদের উপর অননুমোদিত ও বেআইনী মনে করে এসেছে এবং প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণা করে থাকে ইরানিরা সেসব সম্পর্ককে ঘৃণা ও অবৈধ বলে স্বীকার করত না। সম্রাট ২য় ইয়াযদাগিদ, যিনি ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজত্ব করেছিলেন, আপন কন্যাকে বিবাহ করেন, অতঃপর তাকে হত্যা করেন।

. J.M. Roberts, History of the World (The United States: The Amazon Book Review, 1907), Vol. vii- p. 175

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শাসক বাহরাম আপন বোনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অধ্যাপক আর্থার ক্রিস্টিন্সেন এর বর্ণনা মোতাবেক ইরানে এ জাতীয় সম্পর্ককে কোন রকম অবৈধ কাজ বলে মনে করা হতো না, বরং একে ইবাদত ও পূণ্য কর্ম মনে করা হতো। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্গ বর্ণনা করেন, ইরানী আইনে ও সমাজে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন প্রকার সম্পর্কের বাচ-বিচার ছিল না।

আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী, তাফসীরে তাবারী শরীফ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), খ. ৩. পৃ. ১৩৮

খ্রি. ৩য় শতাব্দীতে দুনিয়ার বুকে মানীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আন্দোলন ছিল বস্তুতপক্ষে দেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র যৌনপ্রবণতার বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক ও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং আলো ও আঁধারের মনগড়া দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিস্বরূপ। অনন্তর মানী চিরকুমার জীবন অবলম্বনের আহবান জানান যাতে দুনিয়া থেকে মন্দ ও অন্যায় অনাচারের জীবাণু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তিনি এই দার্শনিক ঘোষণা দিয়েছিলেন, আলো ও আধারের মিশ্রণই যাবতীয় অনাসৃষ্টির কারণ। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। এই ভিত্তিতে তিনি বিবাহকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, যাতে করে মানুষ যথাসত্তর নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এভাবে মানব জাতির অবলুপ্তির মাধ্যমে আলো অন্ধকারের ওপর চিরস্থায়ী বিজয় লাভ করেন। বাহরাম ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মানীকে এই বলে হত্যা করেন, এই লোকটির বিশ্বের ধ্বংসের আহবান জানাচ্ছে। এই জন্য দুনিয়া খতম হওয়ার আগে এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পূর্বে তার নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু মানী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নিহত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রচারিত শিক্ষা বহুদিন যাবত বেঁচে ছিল এবং মুসলিম বিজয়ের পরেও এর প্রভাব অবশিষ্ট ছিল।

ইরানের জনগণের বিশ্বাস ছিল, ঐসব সম্রাটের প্রত্যেক মানুষের উপর জন্মগত অধিকার রয়েছে, কিন্তু অন্য কারো সম্রাটের উপর অধিকার নেই। ইরানের জনগণ মনে করত, ঐ পরিবারের লোকেরাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং সাম্রাজ্যের কেবল তারাই মালিক হতে পারেন। আর এই অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা থেকে পুত্রে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তরিত হতে থাকবে। এতে কারোর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। যদি ঐ পরিবারে কোন প্রবীণ ও বয়স্ক লোক না পাওয়া যেত তাহলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন শিশুকেই নিজেদের সম্রাট হিসেবে মেনে নিত। যদি কোন পুরুষ না পাওয়া যেত তাহলে কোন মহিলাকেই রাজমুকুট পরিধান করানো হতো।

বৌদ্ধ মতবাদ, এর পরিবর্তন ও বিকৃতি

বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এবং তার অবতার ও দেবতাসমূহকে আত্তীকরণ করে নিজের অস্তিত্বকেই হারিয়ে ফেলেছিল। বৌদ্ধ ধর্মবাদ মূর্তি পূজার ধর্মের রূপ গ্রহণ করে। যেসব দেশেই এই ধমের অনুসারীরা গেছে সেখানেই তারা মূর্তি সাথে নিয়ে গেছে এবং যেখানেই যেত সেখানেই যে কাজটি তারা সর্বপ্রথম করত তা হলো গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন এবং তার প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি তৈরিকরণ। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ঐসব প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতি দ্বারা ঢাকা দেখতে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ঈশ্বর টোপা তদীয় ভারতীয় সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে বলেন, "বৌদ্ধ মতবাদ-এর ছত্রছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভিতর অবতারের ছড়াছড়ি, মূর্তি পূজার অবাধ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দেখা যেতে লাগল। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য-নতুন প্রথা-পদ্ধতি একের পর এক দৃষ্টিগোচর হতে থাকলো।
প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু তাঁর Discovery of India গ্রন্থে বৌদ্ধ মতবাদের বিকৃতি ও ক্রমাবনতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ মতবাদ ও তাই করল। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে উঠে এবং গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়। সংঘের ভেতর নিয়ম শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে যাদু ও নানারূপ অলীক কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ভারতবর্ষের সহস বর্ষব্যাপী নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ মতবাদের অবনতি শুরু হয়।

. *Jawaharlal Nehru, The Discovery of India (Delhi: Oxford University Press, 2003), p. 201*

মোদ্দাকথা, চীনসহ বৌদ্ধ মতবাদের অনুসারীদের কাছে বিশ্বের জন্য দেবার মত কোন পয়গাম ছিল না যার আলোকে গোটা বিশ্ব তাঁর সমস্যাবলীর সমাধান খুজতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সহজ-সরল রাস্তা পেতে পারে।

মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার অপরাপর জাতিগোষ্ঠী বিকৃত বৌদ্ধ মতবাদ ও বর্বরতাপূর্ণ মূর্তি পূজার মাঝে অবস্থান করছিল। তাদের কাছে না ছিল জ্ঞান গত কোন সম্পদ আর না ছিল কোন উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতিমালা। আসলে এসব জাতিগোষ্ঠী একটি মধ্যবর্তী কাল অতিক্রম করছিল। তারা মূর্খতা সর্বস্ব মূর্তিপূজা থেকে বেরিয়ে সবেমাত্র সভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী এমনও ছিল যারা সে সময় পর্যন্ত নগর সভ্যতা ও নগর জীবনের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছিল।

ভারতবর্ষ: ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত, খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে যে যুগ শুরু হলো তা ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে এ দেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত ও অন্ধকারতম যুগ ছিল। পার্শ্ববর্তী দেশ গুলোতে বিরাজমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে এ দেশটি কারোর চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এ ছাড়া এ দেশটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। এ বৈশিষ্ট্য গুলোর সর্বাধিক উল্লখেযোগ্য হলো: ১. দেব দেবীর সংখ্যাধিক্য ২. যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ৩. জাতিবেদ ও শ্রেণী বৈষম্য।

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মূর্তিপূজার ছিল রমরমা অবস্থা। বেদে দেবতাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩, ঐ শতাব্দীতে এ সংখ্য ক্রমান্বয়ে ৩৩ কোটিতে উন্নীত হয়। এ যুগে পছন্দনীয় বস্তু, আকর্ষণীয় জিনিস, প্রয়োজন পূরণে সক্ষম বস্তু মাত্রই পূজ্য দেবতায় পরিণত হয়। ফলে তাদের পূজ্য মূর্তি, প্রতিকৃতি, দেবতা ও দেবদেবীর সংখ্যার কোন ইয়ত্তা ছিল না। এ সব দেবতা ও পূজ্য বস্তুর মধ্যে খনিজ দ্রব্য, জড় বস্তু, বৃক্ষাদি, উদ্ভিদরাজি, পাহাড়-পর্বত, নদ- নদী, জীব-জন্তু, এমনকি যৌনাঙ্গ ও শামিল ছিল। আর এভাবে এ প্রাচীন ধর্ম গল্পলোকের কল্প কাহিণী, আকিদা-বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার একটি দেব উপাক্ষনে পরিণত হয়।

W. Gustave le Bon তাঁর less Civilizations De la India নামক গ্রন্থে লিখেছেন, The Hindu, of all people, stands most unavoidably in the need of visible objects for religious worship, and although at
different times religious reformers have tried to prove monotheism in the Hindu faith, it has been an availing effort.

From the Vedic age to the present day, the Hindu has been worshiping all sorts of things. Whatever he cannot understand or control is worthy of being adored as divine in his eyes. All attempts of Brahmans and other Hindu reformers in the direction of monotheism or in limiting the number of Gods two three have been utterly unsuccessful. The Hindus listened to them and sometimes even accepted their teaching in principle, but in practice the three Gods went on multiplying till they began to see a God in every article and phenomenon of nature.

অর্থাৎ, "দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু এমন একটি জাতি যাদের পূজায় বাহ্যিক একটা না একটা অবয়ব থাকতেই হবে। যদিও বিভিন্ন যুগে ধর্মীয় সংস্কারকগণ হিন্দু ধর্মে একত্ববাদ রয়েছে বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাদের এ প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল। হিন্দুদের নিকট বৈদিক যুগেই হোক আর বর্তমানকালেই হোক, প্রতিটি বস্তুই অবোধ্য ও অপ্রতিরোধ্য আরাধ্য উপাস্য। ব্রাহ্মণ ও দার্শনিক পণ্ডিতদের কেবল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াসই নয়, বরং তাদের সেই সমস্ত প্রয়াসই যা তারা দেবদেবীর সংখ্যা কমিয়ে তিনে আনার জন্য চালিয়েছে তা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের শেখানো কথা শুনেছে এবং কবুল করেছে, কিন্তু কার্যত এতে করে তাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাস পায় নি, বরং তা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং প্রতিটি রঙ, রুপ, বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে তারা তাদের অবতার দেখতে পেয়েছে। <u>*প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০-৪১*</u>

যৌন অরাজকতা

যৌন আবেগ ও যৌন প্রবণতাকে উস্কানী দানকারী উপাদান ধর্মীয় রূপে যতটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় ততটা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। দেশের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও ধর্মীয় মহলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং সৃষ্টি ও জন্মের কার্যকারণ বিশ্লেষণ, দেবতা ও দেব-দেবীদের সঙ্গম, সহবাস এবং কোন কোন পরিবারের এমন সব ঘটনা ও বর্ণনা বিবৃত করেছে যা শুনলে লজ্জায় মাথা নীচু ও কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে। বড়ই নিষ্ঠা ও ভক্তিসুলভ আবেগের সাথে উল্লেখিত কাহিনীগুলো পুনরাবৃত্তিকারীর সহজ-সরল ধর্মপরায়ণ লোকেদের উপর যে প্রভাব পড়ে তা সহজে অনুমেয়। তাদের মধ্যে অজান্তে তাদের স্নায়ু ও আবেগের উপর এসব বর্ণিত কাহিনীর যে প্রভাব পড়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন বড় দেবতা শিবের লিঙ্গের পূজা হতো এবং শিশু-যুবা ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এতে অংশগ্রহণ করত।

ড. গুস্তাব লী বন এ প্রসঙ্গে বলেন, "মূর্তি ও বাহ্যিক প্রতীকের প্রতি হিন্দুদের আকর্ষণ ও অনুরাগ সীমাহীন। তাদের ধর্ম যাই হোক, তাঁর অনুষ্ঠানাদি তারা অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তাদের মন্দিরগুলো আরাধ্য ও সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এসবের মধ্যে সর্বাগ গণ্য হলো লিঙ্গ ও যোনী যা প্রজন্মেরই ইঙ্গিতবহ। অশোক স্তম্বকেও সাধারণ হিন্দুরা লিঙ্গের প্রতীক মনে করে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী শঙ্কু আকৃতির বস্তু মাত্রই তাদের কাছে সম্মানযোগ্য। "
প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

শ্রেণীভেদ প্রথা

পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাস এত সুস্পষ্ট শ্রেণী বৈষম্য, পেশা ও জীবনের কর্মের এমনতর অনড় ও অটল বিভক্তি কমই দেখা গেছে, যেমনটা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জাতপাতের ভেদ বৈষম্য ও একই পেশার যাঁতাকালে বন্দি হবার সূচনা বৈদিক যুগের শেষ দিকে শুরু হয়। আর্যরা তাদের বংশ ও বংশীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে, এদেশে বিজেতা হিসেবে তাদের অবস্থানগত মর্যাদা কায়েম রাখতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অব্যাহত রাখার স্বার্থে শ্রেণীভেদ প্রথা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অপরিহার্যভাবে ঘোষণা করে।

ড. Gustave le Bon-এর ভাষায়, We have seen that, towards the close of the Vedic age, occupation had started become more or less hereditary, and the germ of the caste system had been sown. The Vedic Aryans were alive to the need of maintaining the purity of their race by not m ixing with the conquered peoples and they advanced towards the east and subjugated vast populations, this need became still more manifest and the law-givers had to pay due regard to it. The Aryans understood the problems of race
well; they had come to realize if a ruling minority did not take proper care of itself, it was rapidly assimilated wit5h the servile population and deprived of its identity.

অর্থাৎ, "বৈদিক যুগের শেষ দিকে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন পেশা কমবেশি পৈতৃক রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছিল এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল যদিও তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি। বৈদিক আর্যদের এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, তারা তাদের প্রাচীন বংশধারাকে বিজিত জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রিত হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। এবং যেই মুহূর্তে এই স্বল্পসংখ্যক বিজেতা পূর্বদিকে অগ্রসর হলো এবং তারা এ দেশীয় জাতি গোষ্ঠীর এক বিরাট দলকে তারা পরাভূত করল এখন এর প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেল এবং বিধায়কদের এর প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। বংশধারার সমস্যা আর্যরা বেশ ভালো বুঝেছিল। তারা আগেভাগে জেনেছিল, যদি স্বল্প সংখ্যক বিজেতা কম জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা না

করে তবে তারা যথাসত্তর বিজিত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হারিয়ে যায় এবং তাদের নাম নিশানও আর অবশিষ্ট থাকে না। "
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা

ব্রাহ্মণী যুগে নারীর সে মর্যাদা ছিল না যা বৈদিক যুগে ছিল। মনুর সংহিতায় নারী সর্বদাই দুর্বল ও অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নারী ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গেই উল্লেখিত হয়েছে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী জীবনন্মতের ন্যায় হয়ে যেত এবং জীবিত থাকতে মৃতের দশায় উপনীত হতো। সে আর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। তার ভাগ্যে জুটত তীব্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা। বিধবা হবার পর তাকে তার মৃত স্বামীর ঘরের চাকরানী ও দেবরের সেবা দাসী হয়ে থাকতে হতো। *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬*

মোটকথা, এই সবুজ শ্যামল দেশ যা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিল, সত্যিকার আসমানী ধর্মের শিক্ষামালা থেকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকায় ও ধর্মের নির্ভর যোগ্য উৎসের বিলুপ্তির দরূন কষ্ট-কল্পনা ও বিকৃতির শিকার এবং রসম-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতির পূজারীতে পরিণত হয়েছিল। সে সময়কার পৃথিবী তো অজ্ঞতা, মূর্খতা, কল্পনা-পুজা, নীচু স্তরের মূর্তিপূজা, প্রবৃত্তি পূজা, শ্রেণীগত বৈষম্যের ব্যাপারে ছিল অগ্রগামী এবং পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে নিজেই ছিল অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার মাঝে নিমজ্জিত।

জাহিলী যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের পূর্বেকার আরবদের অবস্থা ছিল বিকৃত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নীতিগর্হিত। তাদের অধিকাংশ লোকই ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ঘৃণ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী ও পাহাড় পর্বতের পূজায় লিপ্ত ছিল। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন- The religion of the Arabs as well as their political life was an a thoroughly primitive level.

Tor Andrae, Mohammed: The man and his faith, 1936, translated by Theophil Menzel (Kolkata: Cirayot publication, 1960), p. 13

(১) মূর্তিপূজা: অজ্ঞতা ও মূর্খতার উন্নতির সাথে সাথে গায়রুল্লাহর পূজার আকীদাও ব্যাপক ও জনপ্রিয় এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াহদানিয়াত ও রবুবিয়াত এর ধারণা দুর্বল ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। এমন কি ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতিগোষ্ঠী মূর্তি ও পুতুলের পরিষ্কার ও খোলাখুলি পূজায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে কার্যত ও অন্তর-মন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে অন্যান্য উপাস্য দেবদেবী ও মূর্তির সঙ্গে কায়েম হয়ে গিয়েছিল এবং বন্দেগী ও দাসত্বের প্রকাশের পন্থা ও আমলসমূহ সেগুলোর সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশে প্রকাশ্যে মূর্তি পূজা, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও সুস্পষ্ট শিরক-এর রাজত্ব চলছিল।

(২) দেবদেবীর পূজা: সর্বকালে সর্বযুগে ও সবদেশে কাফির-মুশরিকদের যেই অবস্থা আরবদের অবস্থা ও তাঁর থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের উপাস্য দেব-দেবী ছিল বহু। এসবের ভিতর ফেরেশতা, জিন ও নক্ষত্রপুঞ্জ সবই শামিল ছিল। ফেরেশতাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা আল্লাহর কন্যা সন্তান। এজন্য তারা ফেরেশতাদের নিকট সুপারিশ কামনা করত, তাদের পূজা করত এবং তাদেরকে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করত। জিনদেরকে আল্লাহর শরীক জ্ঞান করত, তাদের শক্তি ও প্রভাবের ব্যাপারে বিশ্বাস করত এবং তাদের পূজা করত। হযরত সা'দ (র.) বর্ণনা করেন, হিময়ার গোত্র সূর্যের পূজা করত। কিনানা গোত্র চাঁদের পূজারী ছিল। বনু তামীম ওয়াবরানের, লাখম ও জুযাম বৃহস্পতির, তাঈ গোত্র সুহায়ল-এর, বনু কায়স শে'রা নক্ষত্রের ও বনু আসাদ বুধ গ্রহের পূজা করত। *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪*

(৩) কাবাগৃহে প্রতিমা: তৎকালীন আরবদের ধর্মীয় কুসংস্কার এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্বর আরবরা পবিত্র কাবা গৃহে লাত, মানাত, উযযা, হোবল সহ **৩৬০** টি প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করে ছিল। হোবল ছিল এদের মধ্যে সবার প্রধান। এদের অধিকাংশ ছিল নারী আকৃতির, এসব দেব-দেবীকে আল্লাহর কন্যারূপে কল্পনা করত। যেমন-আল কুরআনে এসেছে:

"إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا

অর্থাৎ তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে।

আল-কুর'আন, ৪: ১১৭

(৪) নবীদের প্রতিকৃতি: জাহিলী আরবের লোকেরা মূর্তি পূজার পাশাপাশি কয়েকজন নবীর প্রতিকৃতি তৈরি করে পূজা করত। তাঁরা হযরত ইবরাহীম, ঈসা, ইসমাইল, মারয়াম (আ.) প্রমূখের মূর্তি কাবা ঘরে স্থাপন করে ছিল।

বিশ্বব্যাপী অন্ধকার

মোদ্দাকথা, এই ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীতে সমগ্র পৃথীবিতে এমন কোন জাতিগোষ্ঠী দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না যাদেরকে সুরুচিসম্পন্ন বলা যায়। সে যুগে না ছিল কোন কোন উচ্চ মূল্যবোধের ধারক-বাহক কোন সমাজ, না ছিল এমন কোন হুকুমত যার বুনিয়াদ ন্যায় নীতি ও প্রেম প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন প্রতিভাবান কোন নেতৃত্ব ছিল না এবং এমন কোন ধর্ম ছিল না যা সহীহশুদ্ধ এবং আম্বিয়া-ই কিরাম এর দিকে সহীহভাবে সম্বন্ধযুক্ত আর তাঁদের শিক্ষামালা ও সমূহ বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক। এই ঘনঘোর অন্ধকার মাঝে কোথাও কোন ইবাদাতগাহ ও খানকাহর মাঝে কখনো যদিও বা যৎসামান্য আলোক-রশ্মি চোখে পড়ত তার অবস্থাও ছিল এমন যেন বর্ষাঘন অন্ধকার রাত্রে জোনাকির আলো। সহীহ ইলম ও বিশুদ্ধ আমল এত দুর্লভ ও দুষ্পাপ্য ছিল এবং আল্লাহর সোজা-সরল রাস্তার সন্ধান দানকারীর সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলত যে, ইরানের বুলন্দ হিম্মত, অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতির যুবক সালমান ফারেসী যিনি আপন জাতিগোষ্ঠী ও বংশীয় ধর্ম থেকে অতৃপ্ত ও নিরাশ হয়ে সত্যের সন্ধানে ইরান থেকে শুরু করে সিরিয়ার শেষ সীমান্ত অবধি দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভূভাগ চষে ফিরে মাত্র চারজন মানুষ এমন পেয়েছিলেন যাঁদের থেকে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত ও অশান্ত হৃদয় প্রশান্তি লাভ করেছিল এবং যারা তাঁদের নবী-রাসূলদের কথিত ও প্রদর্শিত পথের ওপর কায়েম ছিলেন। বিশ্বব্যাপী এই অন্ধকার ও অরাজকতার যেই চিত্র কুরআন মাজীদ এঁকেছে এর থেকে সুন্দর চিত্র আঁকা আদৌ সম্ভব নয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।

প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দ্বীনই ছিল ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে মুহাম্মদীই ইসলাম নামে পরিচিত হয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। মূলত, মুসলিম উত্থান রাসূলুল্লাহ (স.) কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।"

গ্যালিপুলি অভিযান

এপ্রিল ১৯১৫ সালে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রাঞ্চ সম্মিলিত ভাবে তুরস্কে আক্রমন করে ইস্তাম্বুল দখল এর জন্য। এটি গ্যালিপলি অভিযান নামে পরিচিত। ইস্তাম্বুল দখল করতে পারলে ব্লাক সি এবং দারদেনালস স্টেট এবং মর্মর সাগরের এর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই সর্ব শক্তি দিয়ে মিত্র শক্তি তুরস্ক আক্রমন করে। আট মাস এই যুদ্ধ চলে। এই গ্যালিপলি অভিযান মিত্র শক্তির জন্য একটি বড় বিপর্যয় হয়। তারা অটোমানদের কাছে পরাজিত হয়। তাদের ১ লক্ষ ১৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। বিজয়ী হলেও অটোমানদেরও প্রায় একই পরিমাণ সৈন্য নিহত হয়। এবং এটিই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধে মুসলিমগণের একমাত্র বিজয়। এ যুদ্ধে ওসমানীয়দের পক্ষে নেতৃত্ব দেন যে জেনারেল তিনি অসম্ভব বিখ্যাত হয়ে যান। তার নাম মোস্তফা কামাল পাশা। যিনি পরে খলিফা আব্দুল মজিদকে হটিয়ে খেলাফত এর অবসান ঘটান এবং তুরস্কের ক্ষমতা দখল করে আতার্তুক (জাতির পিতা) উপাধি গ্রহণ করেন। মোস্তফা কামাল এর উত্থান হযরত আবু বকর (রা.) থেকে শুরু হওয়া খেলাফাত এর অবসান ঘটে। ক্ষমতা দখল করে মোস্তফা কামাল ইসলামের বিরুদ্ধে চরম রুদ্র মূর্তি ধারণ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাতারাতি সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হয়। সেক্যুলার স্কুল চালু করা হয়। ইসলামি শিক্ষা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ধর্মীয় অবকাঠামো গুলোও ধ্বংস করা হয়। শরি'আ কাউন্সিল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ধর্মীয় বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। সূফীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। শরি'আ আদালত অবৈধ ঘোষণা করে দেশের সকল কাযীকে বরখাস্ত করা হয়। "

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

তুর্কিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকেও কামাল পাশা সেক্যুলার নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এর চেষ্টা করেন: ১. পাগড়ি বা টুপি পড়া নিষিদ্ধ করা হয়। ২. সরকারী ভবনগুলোতে হিজাব নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ৩. হিজরি ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করা হয়।

http://www.somewhereinblog.net/blog/samilz7/29987240, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২০ ডিসেম্বও, ২০১৬

৪. ১৯৩২ সালে আরবিতে আযান দেয়া নিষিদ্ধ করে তুর্কি ভাষায় আযান চালু করা হয় এবং দেশের হাজার হাজার মসজিদে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। ৫. জুমাবারের পরিবর্তে শনিবার এবং রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

সেই সময় তুর্কিদের শিক্ষার হার খুবই কম ছিল। শিক্ষার হার বাড়ানোর অজুহাত দেখিয়ে কামাল পাশা আরবি বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন চালু করলেন। ল্যাটিন বর্ণ চালুর সাথে সাথে আরবি শব্দগুলোর তুর্কি প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে একটি কমিশন গঠন করেন।

এবং সর্বশেষ ধর্মনিরপেক্ষকে ভবিষ্যৎ থ্রেট থেকে বাঁচাতে কামাল পাশা সাংবিধানিকভাবে সেনাবাহিনী এবং বিচার বিভাগে আমূল সংস্কার করেন। সেনাবাহিনীকে তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষক করা হয়। এবং সাংবিধানিকভাবে সেনাবাহিনীকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য তারা যা ইচ্ছা করতে পারবে। (পরে তুরস্কের বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীকে সেনাবাহিনী ফাঁসি দেয় এই ক্ষমতা বলে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে জেল দেয় ইসলামি কবিতা পড়ার অপরাধে!)। ইসলাম তথা মুসলিমদের উপর কতটা মারাত্মক এর প্রভাব তা সহজেই অনুনেয়। উপমহাদেশে তখন বিখ্যাত খেলাফত আন্দোলন হয় কামাল পাশার এই কর্মকাণ্ডের জন্য।

বাগদাদ এর পতন

১৯১৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর ইংল্যান্ড বাগদাদ অভিযান ঘোষণা করে। তারা মূলত বসরা দিয়ে হামলা চালায়। এই ফ্রান্ট এ তিন মাস যুদ্ধ চলে ওসমানীয় এবং ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে। ওসমানীয়দের নেতৃত্ব দেন খলিল পাশা আর ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন জেনারেল ফ্রেডেরিক স্ট্যানলি মাউডু। ১৯১৭ সালের ১১ মার্চ জেনারেল ফ্রেডেরিক স্ট্যানলি মাউডু (Frederick Stanley Maude) এর নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনী এর হাতে বাগদাদ এর পতন ঘটে। ৯ হাজার এরও বেশি ওসমানীয় সৈন্য বন্দী হয় ব্রিটিশ বাহিনী এর হাতে। "১৮১

জেরুজালেমের পতন

১৯১৭ সালের ১৭ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত জেনারেলদের একজন জেনারেল এ্যাডম এ্যালেনবে (Edmund Allenby) এর নেতৃত্বে ব্রিটেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এর একটি সম্মিলিত বাহিনী পবিত্র শহর আল কুদস বা জেরুজালেম এর উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। এছাড়া মিত্র বাহিনীর অন্য কমান্ডার ছিল অস্ট্রেলিয়ার হ্যারি কাওভেল (Harry Chauvel), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার হ্যারি বুলফিন (Edward Bulfin)। ওসমানীয়দের পক্ষে ছিল আলি ফুয়াদ পাশা, জাভেদ পাশা এবং জার্মানি এরিখ ভন ফলকেনউন (Erich von Falkenhayn) ফ্রেদেরিখ ক্রেস ভন ক্রেসিন্তিন (Friedrich von Kressenstein)। ১৩ দিন ব্যাপি যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী জয় লাভ করে।

দামেস্কের পতন

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ব্রিটেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, মক্কা শরীফ এবং ফ্রান্স এর সম্মিলিত বাহিনী হাইফা থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্য অভিযান শুরু করে। ওসমানীয় এবং জার্মান বাহিনী তাদের এই বিশাল বাহিনীর সামনে দাড়াতেই পারে নাই। মাত্র ৪ দিনেই দামেস্কের পতন ঘটে। সম্মিলিত ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় জেনারেল এ্যাডম এ্যালেনবে (Edmund Allenby). তাকে বলা হত Bloody Bull. এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হ্যারি কাওভেল (Harry Chauvel), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার হ্যারি বুলফিন (Edward Bulfin) এবং শরীফ হোসাইন ইব্ন আলীর পুত্র ফয়সাল মিত্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ওসমানীয়দের পক্ষে ছিল মোস্তফা কামাল পাশা, জাভেদ পাশা এবং জার্মানি লিমন ভন স্যান্দারস (Liman von Sanders)।

"*প্রাগুক্ত, পৃ. ৬*

ইস্তাম্বুলের পতন

১৯১৮ সালের ১৩ নভেম্বর মাসে ব্রিটেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ইটালি, গ্রিস, আমেরিকার এর সম্মিলিত বাহিনীর হাতে ওসমানীয় খেলাফাত এর রাজধানী ইস্তাম্বুলের পতন ঘটে। সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার ছিল সমেরেস্ট আরথার গোক ক্যালটোপ (Somerest Arthur Gough Calthorpe) ওসমানীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় আলী সাইদ পাশা।

এভাবে মুসলিম খেলাফাতের বিভিন্ন সময়ের রাজধানী এবং গর্বের সবগুলো ঐতিহাসিক শহর এর একে একে পতন ঘটে। প্রত্যেকটি শহর বাস্তবে মিত্র বাহিনী দখল করে। মুসলিমগণ রাজনৈতিক ভাবে এতটা দূরাবস্থার মধ্যে কখনও পরে নাই। (মঙ্গলদের আক্রমনকে অনেকে এর কাছাকাছি বড় বিপর্যয় বলেন)। "*প্রাগুক্ত, পৃ.৭*

মধ্যপ্রাচ্য এর ভাগ

মহাযুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ সালের প্যারিস এ বিখ্যাত প্যারিস পিস কনফারেন্স শুরু হয়। এই পিস কনফারেন্স এ ব্রিটিশ সরকার ওসমানীয় খেলাফাত এর ভূমি ভাগা-ভাগি নিয়ে কিছুটা বেকায়দায় পরে। কারণ এই সময় তারা তিন পক্ষের মুখোমুখি হয় শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর পুত্র ফয়সাল, World Zionist Organization এবং সাইক-পিকো এ্যাগরিমেন্টের অন্য পক্ষ যাদের সাথে ব্রিটিশ সরকার একই ভূমি নিয়ে চুক্তি করে। প্রথমেই ব্রিটিশ সরকার সাইক-পিকো এ্যাগরিমেন্ট অফিশিয়ালি স্বীকৃতি দেয়। ফলে ফ্র্যান্স পায় সিরিয়া তার আশে পাশের এলাকা। ফ্রান্স পেয়েই যে অপকর্মটি করে তা হল সিরিয়াকে ভাগ করে ফেলে জাতীয়তা বা আদর্শ অনুসারে। লেবানন নামে আলাদা দেশ বানায় আরব খ্রিস্টানদের জন্য (যদিও এখন লেবানন এখন একটি বহুধর্মীয় দেশ)। দ্রুযিদের জন্য আলাদা অংশ নাম দিয়েছিল আল দ্রুযি স্টেট, আল অয়াতি উপজাতিদের জন্য আল অয়াতি স্টেট, সুন্নিদের জন্য স্টেট অব দামাস্কাস।

ফ্র্যান্স প্রায় ৩০ বছর সিরিয়া এভাবে শাসন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিরিয়া বিপ্লব হয় এবং সিরিয়ানরা ফ্রেঞ্চদের বের করে দেয় তবে লেবাননকে আর ধরে রাখতে পারে না লেবানন আলাদা রাষ্ট্রই থাকে। ফ্রেঞ্চরা শাসন এর সময় একটি আল অয়াতি উপজাতিদের গ্রুপকে বেঁছে নেয় এবং নানান সুযোগ সুবিধা দেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের উপর ফ্রান্স এর পক্ষে পুলিশি করতে। এই আল অয়াতি উপজাতিরা ছিল সিরিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর, ডাকাত, অশিক্ষিত এবং অনেকটা বর্বর সম্প্রদায়। ইতিহাসে আল অয়াতি উপজাতিদেরকে একটি

ডাকাত সম্প্রদায় হিসেবেই দেখা যায় তারা পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় বাস করতো এবং সুন্নিদের গ্রাম এবং শহরগুলোতে ডাকাতি করতো। সুন্নিরা এই আল অয়াতিদের ভয় পেত। ফ্রেঞ্চরা এসে এই আল অয়াতিদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং প্রচুর সামরিক সহায়তা করে। ফলাফল ৩০ বছর পর যখন ফ্রান্স সিরিয়া ছেড়ে চলে যায় এক আল অয়াতি জেনারেল হাফিজ আল আসাদ সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করে। তারই ছেলে বাশার আল আসাদ এখন সিরিয়া এর ক্ষমতায়। *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮*

সাইক-পিকো এ্যাগরিমেন্ট অনুযায়ি ইংল্যান্ড ইরাক, ট্রান্স জর্ডান (বর্তমান ম্যাপে জর্ডান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল) এবং হিজায পায়। ব্রিটিশ সরকার বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী World Zionist Organization-কে ফিলিস্তিনের একটা অংশ দিয়ে দেয়। হোসাইন- ম্যাকমোহন এ্যাগরিমেন্ট এর সুরাহা করতে তারা একটি অভিনব কৌশল গ্রহণ করে। শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর ছিল ৩ পুত্র ছিল। তারা বড় ছেলে আলী বিন শরীফ হোসাইন কে দেয় হিজায। এবং আলী ক্ষমতায় গিয়েই নিজেকে হিজায এর রাজা এবং মুসলিমগণের খলিফা ঘোষণা করে। আলী ১৯২৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ৩ মাস হিজায শাসন করে। সে আল সৌদের কাছে ক্ষমতা হারায়। এই আল সৌদকেও অর্থ এবং অস্ত্র ব্রিটেনই দেয়। আল সৌদ হিজায দখল করে নিজেকে
ঘোষণা করে এবং বংশের নামে দেশের নাম দেয় “সৌদি আরব”। এর মাধ্যমে শরীব হোসোইন ইবনে আলী এবং তার পরিবার মক্কা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়। তারা একাকী অত্যন্ত নির্মম ভাবে মারা যায় এবং ওসমানীয় খেলাফাত এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পায় শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর মেজু পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ বিন শরীফ হাসাইন। তাকে দেওয়া হয় জর্ডান। আব্দুল্লাহ ক্ষমতায় গিয়ে নিজেকে হাশেমি (নবীজির বংশ) জর্ডান এর রাজা ঘোষণা করে। এবং এই আব্দুল্লাহ শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর একমাএ ছেলে যে ক্ষমতায় টিকে ছিল শেষ পর্যন্ত। তার পর তার নাতি হোসাইন ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯৯ জর্ডান এর ক্ষমতায় ছিল। হোসাইন এর মৃত্যুর পর তার ছেলে আব্দুল্লাহ জর্ডান এর ক্ষমতায় বসেন। এবং তিনি এখনও জর্ডান শাসন করছেন। শরীফ হোসাইন ইবনে আলীর ছোটে পুত্র এর নাম ছিল ফয়সাল। তার সাথে টি ই লরেন্সের সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক ছিল। ফয়সাল নিজেকে ইরাকের রাজা ঘোষণা করে। তবে ইরাকের মানুষ তাকে প্রত্যাখান করে। তখন ব্রিটিশ সরকার ফয়সালের পুত্র গাজাকে গভর্নর বানায়। ইরাকের মানুষ তাকেও প্রত্যাখান করে। এর পর ব্রিটিশ সরকার গাজা এর পুত্র ফয়সাল ২য়কে গভর্নর বানায়। ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই ইরাকি আর্মি বিদ্রোহ করে। তারা শরীফ পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে একটি

বাসায় একত্রিত করে গুলি করে হত্যা করে। সে সময় একজন তরুণ আর্মি অফিসার বেশ বিখ্যাত হয় (শরীফ পরিবারের হত্যাকাণ্ডের সময় ছিল না)। এই তরুণ অফিসার ১৯৬৮ সালে ইরাকের ক্ষমতা দখল করে। তার নাম সাদ্দাম হোসেন। ”

এভাবেই এক মুসলিম উম্মাহ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। তৈরি হয় গভীর ক্ষত। যার দাগ মুসলি বিশ্ব এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে। আরও কতদিন বয়ে বেড়াতে হবে তা আল্লাহ জানেন।

ক্রুসেড ও জঙ্গি খান্দান

খ্রিষ্টান ইউরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ফিরে ইসলামের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। মুসলিমগণ তাঁর গোটা প্রাচ্য সামাজ্যের উপর দখল জমিয়ে রেখেছিল এবং তাদের সমস্ত পবিত্র স্থানেই মুসলিমদের দখলে ছিল। কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সমাজ্যের উপস্থিতিতে ও প্রতিবেশী খিস্টান রাজ্যগুলোর উপর তাদের অব্যাহত অগাভিযানের দরুন তাদের আক্রমণ পরিচালনা করার সাহস হতো না। হিজরী পঞ্চম খি. ১১শ শতাব্দীর শেষে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, ইউরোপের ক্রুসেড যোদ্ধারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাদের সেনাবাহিনী বন্যা ও তুফানের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ৪৯২ হি./ ১০৯৯ খি. সনে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম (বায়তুল মুকাদ্দাস) জয় করে নেয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের এক বিরাট অংশই তাদের দখলে চলে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপন বলেন:

The crusaders penetrated like a wedge between the old wood and the new and for a while seemed to cleave the trunk of Mohammad an Empire into splinters. অর্থাৎ, “ক্রুসেডাররা এসব দেশে এমন সহজে ঢুকে পড়েছিল যেমন পুরোনো কাষ্ঠখণ্ডের ভিতর খুব সহজে পেরেক ঢুকানো হয়। স্বল্প সময়ের জন্য এমন মনে হচ্ছিল যে, তারা ইসলামরূপী বৃক্ষের মূল কাণ্ড উপড়ে ফেলে তা ধুনিত তুলার মতো উড়িয়ে দেবে। ”

"

Stanley Lane-Poole, Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem (London: G. P. Putnam's Sons, 1906). p. 214

ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলিমদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ করে ইয়াকুত আল-হামাবী বলেন, "So terrible, it is said, was the carnage which followed that the horses of the crusaders who rode up to the mosque of Omar were knee deep in the stream of blood. Infants were seized by their feet and dashed against the walls or whirled over the battlements, while the Jews were all burnt alive in their synagogue."

অর্থাৎ, "বায়তুল মুকাদ্দাসে বিজয়ি বেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে পাইকারি হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, যে সব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে ওমর (রা.) তে গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে পা ধরে দেওয়াল গাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে ইয়াহুদীদেরকে তাদের সিনাগগের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। "

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন এবং খ্রিষ্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ সংকেত। খ্রিষ্টানদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এরপর থেকে এতখানি বেড়ে যায় যে, কিরক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মুআয্যামা ও মদীনার ওপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে বেশি নাযুক মুহূর্ত ও বিপজ্জনক সময় আর আসেনি।

তাতারী ফেতনা

এ সব বন্য ও বর্বর আক্রমণের মধ্যে সব চাইতে বড় আক্রমণ ছিল তাতারীদের আক্রমণ যা পিপীলিকা ও পতঙ্গের ন্যায় প্রাতা ভূষন্ড থেকে অগ্রসর হয় এবং সমগ্র মুসলিম আহান ছেয়ে ফেলে। তাতারী আক্রমণ মুসলিম আহানের জন্য ছিল এক মহাদুর্যোগ যার ফলে মুসলিম বিশ্বের ভিত্তিই নড়বড় হয়ে যায়। মুসলিমরা ছিল হতবিহবল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক ধরনের ত্রাস ও নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। একবার তো প্রায় গোটা মুসলিম জাহানই (বিশেষ করে এর প্রাচ্য ভূখণ্ড) এ মর্মবিদারক ফেতনার আওতায় চলে এসেছিল। ঐতিহাসিক ইবন আছিরও এই ঘটনায় কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর মনের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া প্রাচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন।"এ এমনই এক দুর্ঘটনা ও এমনই এক মসীবত যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোন নদীর পাওয়া যাবে না। এ ঘটনার সম্পর্ক গোটা মানব সমাজের সঙ্গে। যদি কেহ দাবি করে, আদম (আ) এর পর থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বুকে এ ধরনের নির্দয় ঘটনা আর একটিও ঘটেনি তবে তা স্কুল হবে না। আয় তা এজন্য যে, ইতিহাসে এর সমপাল্লার কোন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুনিয়া কেয়ামত পর্যন্ত (ইয়াজুজ মাজুজ ভিন্ন) কখনো যেন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ না করে। ঐ সব বর্বর পশু কারোর প্রতি এতটুকু কৃপা দেখায় নি। তারা নারী- পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছে, মহিলাদের পেট চিরেছে এবং গর্ভস্থ সম্মনকে হত্যা করেছে। লা-হাওলা ওলা তৃওয়াতা ইস্যু বিল্লাহিল আলিয়ই'ল আযিম। এ দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা ছিল যেন বিশ্ব্যাসী। মহাপ্লাবন আকারে এটা দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতেই তা গোটা পৃথিবীটাই যেন ছেয়ে ফেলে।

জামেউল উসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৬৫৬ হিজরিতে এ বন্য ও বর্বর তাতারীরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে এবং এর অস্তিত্ব লণ্ডভণ্ড করে দেয়।ঐতিহাসিক ইবন কাছীর বাগদাদের ধ্বংস ও তাতারীদের ব্যাপক গণহত্যা ও হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে বলেন। "চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও দাংসের রাজত্ব চলে। চল্লিশ দিন পর তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ও জমজমাট এ শহরটি এমনভাবে ফাংস স্তূপে পরিণত হয় যে, মাত্র গুটি কয়েক লোকই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার ও পথ-ঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পূর্ণ। লাশের এক একটি স্তুপ ছোটখাটো একটি টিলার মত মনে হচ্ছিল। এসব লাশের ওপর বৃষ্টিপাত হলে তা ফুলে আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। গোটা শহর ভর্তি গলিত লাশের গন্ধে এলাকার আবহাওয়াই দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকে মহামারী

ছড়িয়ে পড়ে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। দূষিত আবহাওয়া ও মহামারীর কারণে আরও বহু লোক মারা যায়। বাগদাদে তখন দূর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস-এ তিনের রাজত্ব চলছিল।

হাফেয ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি:/১৪১৩হি:), খ. ১৩, পৃ. ৩০৪

মিসরীয় সেনাবাহিনীর মুকাবিলায় তাতারীদের পরাজয়

ইরাক ও সিরিয়া দখলের পর তাতারীদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই মিসরের দিকে ছিল। তখন মিসরই ছিল একমাত্র দেশ যা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মিসরের সুলতান আল-মালিকুল মুজাফফর সায়ফুদ্দীন কুতুষ পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, এবার নির্ঘাত মিসরের পালা। তাতারীরা যদি আগেভাগেই তাঁর ওপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। অতএব, মিসরের অভ্যন্তরে থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শামে তাতারীদের হামলা পরিচালনা পরিচালনা করাটাকেই তিনি সমীচীন মনে করলেন। অনন্তর ৬৫৮ হিজরির পবিত্র মাহে রমযানের ২৫ তারিখে আয়ন-ই জালুত নামক স্থানে তাতারীদের সঙ্গে মিসরের মুসলিম ফৌজের তীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বিপরীত এ যুদ্ধে তাতারীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং তাঁরা পালাতে থাকে। মিসরীয় ফৌজ পলায়নরত তাতারিদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ব্যাপক হারে তাদের কচুকাটা করে। বিপুল সংখ্যক তাতারী মুসলিমগণের হাতে বন্দীও হয়। এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান আলী নদভী বলেন: "সায়ফুদ্দীন কুতুষ-এর পর আল-মালিকুজ-জাহির বায়বারস কয়েকবার তাতারীদের উপর্যুপরি পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া থেকে তাদেরকে উৎখাত ও বহিষ্কৃত করেন। এভাবে 'তাতারীদের পরাজয় অসম্ভব' এই প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। "
মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো? প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

মুসলিম জাহানে তাতারী হামলার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

তাতারী আক্রমণের ফলে মুসলিম জাহানে এমন এক ধাক্কা লাগে যা সামাল দেবার জন্য বহু সময়ের দরকার ছিল। তাতারী হামলার ফলেই মুসলিমগণের চিন্তা শক্তিতে নির্জীবতা ও উদাসীনতা এবং তবিয়তে হতাশা ও স্থবিরতা জন্ম নেয়। এ হামলার ফলে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, রচনা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ ও সামজিকতা সব কিছুর ওপর প্রভাব পড়েছিল। জ্ঞান ও সাহিত্য ভাণ্ডারে নতুন নতুন দিক রচনা, সংস্কার, নির্মাণ ও উন্নয়ন সাধনের পরিবর্তে এখন জ্ঞানী-গুণী ও দ্বীন-ধর্মের ধারক-বাহকেরা কোনমতে বর্তমান পুঁজির রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাযতের যুক্তি সম্মত করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং মানব সভ্যতার এ ছিল এক বিরাট দুর্ভাগ্য যে, দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগডোর সে সব মূর্খ ও বন্য জাতিগোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়েছিল যাঁদের না ছিল কোন আসমানি ধর্ম আর না তারা কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

ও সভ্যতা-সংস্কৃতিরই মালিক ছিল। তাদের নেতৃত্বাধীনে কোন প্রকার জ্ঞানগত ও ধর্মীয় উন্নতির আশা করা যেতে পারে না।

তাদের ইসলাম কবুলের পর যদি ও মুসলিমরা তাদের ফাংসযজ্ঞ ও রক্তপাতের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও মিলেছিল, ইসলাম শাসক শ্রেণীর ধর্ম বনে গিয়েছিল, কিন্তু এইসব নও মুসলিম তাতারীদের মধ্যে আর যা-ই হোক, ধর্মীয় ও তত্ত্বগত নেতৃত্ব দেবার এবং ইসলামী ইমামতের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল না। এ যোগ্যতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি হওয়ার জন্য এক দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিল। সে মুহূর্তে এমন একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত উন্নত মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদ চরিত্রের অধিকারী জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল যারা পতনোন্মুখ মুসলিম জাহান কে সামাল দিতে পারেন, তাদের মধ্যে নতুন জীবন ও নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন এবং মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসতে পারেন।

নেতৃত্বের ময়দানে উসমানী তুর্কীদের আগমন

কিছুকাল পরেই হিজরী ৮ম শতাব্দীতে উসমানী তুর্কীরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয়। তারা দুনিয়াকে সাধারণভাবে ও মুসলিমগণের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে নিজেদের দিকে সে সময় আকর্ষণ করে যখন সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ হিজরী ৮৫৩ সনে/ ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের অজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করে নেন।এ ঘটনা মুসলিমগণের মধ্যে এক নতুন আবেগ-উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তুর্কীরা চাঁদের নেত দিচ্ছিল উসমানী রাজবংশ-এব যোগ্য ছিল যে তাদের ওপর মসলিম distance of one mile, it is said that this cannon was pulled by 700 men and took two hours to be loaded, Muhammad marched upon Constantinople with 300000 soldiers and a strong artillery, His fleet, which besieged the city from the sea, consisted of 120 warships, By great ingenuity the Sultan resolved to send a part of his fleet by land. He launched seventy ships into the sea from the direction of Qadim Pasha by carrying them over wooden boards upon which fat had been applied (to make them slippery.)

অর্থাৎ, "এ বিজয় কেবল ভাগ্যের জোরে কিংবা আকস্মিকভাবে হঠাৎ করে অর্জিত হয়নি। আর কারণ কেবল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বলতাই ছিল না। আসল কারণ ছিল এ. সুলতান মুহাম্মদ অনেক আগে থেকেই এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতগুলো শক্তি ছিল সে সবের সাহায্য নিচ্ছিলেন। সে সময় নতুন নতুন কামান আবিষ্কার হচ্ছিল। তিনি সে যুগে যত বড় বিরাট ও শক্তিশালী কামান তৈরি করা সম্ভব তাঁর জন্য চেষ্টা চালান। এজন্য তিনি হাঙ্গেরির জনৈক ইঞ্জিনিয়ারকে কাজে লাগান। তিনি সুলতানের চাহিদানুযায়ী এমন একটি কামান তৈরি করেন যার সাহায্যে তিনশ কিলোগ্রাম ওথনের গোলা এক মাইল দূরে নিক্ষেপ করা যেত। এ কামান ট্রেনে নেবার জন্য সাতশত লোকের প্রয়োজন পড়ত এবং এতে গোলা ভর্তির জন্য দু ঘণ্টা সময়ের দরকার হতো। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য বহির্গত হন তখন তিন লক্ষ সৈন্য তাঁর অধীনে ছিল আর ছিল বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী কামান বহর। একশ বিশটি জাহাজ সম্বলিত তাঁর নৌবহর কনস্টান্টিনোপলকে সমুদ্রের দিকে অবরোধ করে রেখিছিল। তিনি তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেন সামরিক বহরের একটি অংশ স্থলভাগ নিয়ে উপসাগর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি কাঠের

গুড়িগোলোকে চেঁছে-ছুলে তার উপর চর্বি মাখিয়ে তার উপর দিয়ে জাহাজ বহর টেনে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এভাবে কাসেম পাশার অধীনে ৭০ টি জাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়েছিলেন।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ সম্পর্কে ইউরোপ এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল যে, তাঁর ইন্তিকালে রোমের পোপ আনন্দ উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনদিন অব্যাহতভাবে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার নির্দেশ জারী করেছিলেন।

তুর্কীদের অধঃপতন

তুর্কি জাতির দুর্ভাগ্য যে, উন্নতি-অগ্রগতি ও উত্থান যুগেই তুর্কীদের পতন শুরু হয়ে যায় এবং প্রাচীন জাতিগুলোর পুরাতন রোগ-ব্যাধিতে তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পরস্পরের ভিতর হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা দেখা দিল। সুলতান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে লাগলেন। শাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিগড়ে যায়। চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। প্রশাসকবৃন্দ ও সিপাহসালার জাতি ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে বেঈমানী ও গামারী করতে থাকে। জাতির মধ্যে আরামপ্রিয়তা ও আয়েশী জীবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে থাকে। জাতির সর্বপ্রকার দোষ-ক্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায় সে সবের বিস্তারিত বিবরণ তুর্কিদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে মিলবে।

তুর্কি জাতির স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতা

সবচেয়ে বড় যে রোগটি তুর্কীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়তা ও স্থবিরতা এবং সমরশাস্ত্র, সামরিক সংগঠন ও উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল কুর'আন মাজীদের আয়াত।

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من لونهمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

অর্থাৎ, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের ওপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।"

আল-কুর'আন, ৮: ৬০

এমতাবস্থায় যখন তারা ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ ও জাতি-গোষ্ঠীগুলোর মাঝে ঘেরাও অবস্থায় ছিল তখন তাদের মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এর সে সব উপদেশ সব সময় স্মরণ রাখা দরকার ছিল যা তিনি মুসলিমগণকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা কখনো এ কথা ভুলবে না, তোমরা কিয়ামত অবধি বিপদের মুখোমুখি অবস্থায় রয়েছে এবং এক গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রান্তদেশের ওপর দাঁড়িয়ে আছ। এজন্য তোমাদেরকে সব সময় হুশিয়ার থাকতে হবে, সদাসতর্ক থাকতে হবে, সশস্ত্র অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা তোমাদের চতুর্দিকে শত্রু। তাদের দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের ওপর, তোমাদের দেশের ওপর। কিন্তু নিতান্তই আফসোসের বিষয়, তুর্কীরা নিশ্চিন্তে বসে রইল। স্বস্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে আসন গেড়ে রইল। অপর দিকে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছল। প্রখ্যাত মনীষী আবুল হাসান আলী নদভী তুর্কীদের এ জ্ঞান ও শিক্ষারাজ্যের স্থবিরতা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন:

"পৃথিবীর ওপর যতদিন মুতাকাল্লিমদের দর্শনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল তুরস্কের জ্ঞানী-গুণী ও উলামায়ে কিরাম নিজেদের কাজ নেহায়াত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে থাকেন। সুলায়মানিয়া মাদরাসা ও সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ মাদরাসা সে সময় প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত কালামশাস্ত্রের শেকল ভেঙ্গে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির

ভিত্তি স্থাপন করল যা দুনিয়ার জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তখন আলেম উলামা সম্প্রদায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের আর যোগ্য রইল না। তারা মনে করতেন যে, এয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সে অবস্থায় ছিল সেখান থেকে তা আর এক-কদম ও সামনে অগ্রসর হয়নি। এ ধরনের ধারণা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জেঁকে বসে থাকে। তুরস্ক অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর আলিম-উলামার এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ইসলামী প্রেরণার সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না। কালাম শাস্ত্রীয় দর্শন কিংবা ইলমে কালাম চাই তা খ্রিষ্টানদের হোক অথবা মুসলমানদে হোক তা গ্রীক দর্শনের ওপর স্থাপিত। এর ওপর কম বেশি এরিস্টোটলের এ দর্শন ছিল পৌত্তলিক দর্শন।

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

পাশ্চাত্য জগত যখন প্রকৃতির অধ্যয়ন পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে করতে শুরু করল তখন গির্জার পোপরীদের হুশ-জ্ঞান লোপ পাবার দশা। এদিকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায় সাদৃশ্য বড় বড় আবিষ্কার-উদ্ভাবন হতে লাগলো আর ওদিকে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের মনে ভীতির সৃষ্টি হলো, এবার গির্জার রাজত্ব শেষ হবার পালা।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টান গির্জাকেই আপোসকামিতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। গির্জা তাঁর স্কুল ও ধর্মীয় পাঠশালা-গুলোর সিলেবাসে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যা আগে একেবারেই ইসলামী মাদরাসা গুলোর মতই ছিল, বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু এর সাথে সাথে সে ইন্দ্রিয়াতীত দর্শনকেও পরিত্যাগ করেনি। ফল হলো, গির্জার প্রভাব শিক্ষিত শ্রেনীর ওপর ন্যূনতম পক্ষে একটি অংশের ওপর বহাল থাকে। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট পাদরিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ নতুন শাখাগুলোতে পারদর্শী হতেন এবং নতুন যুগের যুবকদের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন। উসমানীয়দের এখানে আলিম-উলামাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা আধুনিক জ্ঞান- বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করে নি, বরং নতুন চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। এদিকে পতন যুগে তাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ঝামেলায় জড়াবার মত তাদের ফুরসত ছিল না। সোজা প্রেসক্রিপশন ছিল, এরিস্টটলের দর্শনের ওপর আসন গেড়ে বস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ দলীল-প্রমাণের ওপর থাকতে দাও। অনন্তর ইসলামী মাদরাসাগুলোর উনবিংশ শতাব্দীতেও সে রঙই টিকে থাকে যা ছিলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

অমুসলিম অপতৎপরতা, উম্মাহের বিপর্যয় ও উদিত সমস্যাসমূহ

পৃথিবীর দেশে দেশে চলছে হানাহানি। পশ্চিমাদের কূটচালে মুসলিমগণ পর্যুদস্ত। আরবের পেটের ভিতর 'বিষফোঁড়া ইসরাইল ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির চিন্তাশীল নেতারা ইসলামের অগ্রগতি রোধে মিশনারি তৎপরতা, ধর্মবিদ্বেষী এনজিও, হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির প্রসার, নাস্তিকতা প্রচার, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উস্কানি, মুসলিম জন্মহার কমানো, নাগরিকত্ব বাতিলসহ নানাবিধ কার্যক্রম শুরু করেন। এছাড়াও, জনসংখ্যা বা উঠতি শক্তি বাধাগ্রস্ত করার জন্য গণহত্যার মতো কর্মসূচি দিতে ও দ্বিধাবোধ করে না। পাশাপাশি আদর্শিক দিক দিয়ে মুসিলমগণের মাঝে উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। নিচে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি

বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, নবুওয়্যাতের যুগের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে অত্যন্ত সাফল্য জনকভাবে নবুওয়্যাতের পদাঙ্ক অনুসারী খেলাফতী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। এরপরে যে রাজতান্ত্রিক যুগের আভাস দেওয়া হয়েছিল দীর্ঘ দিন যাবত দুনিয়াবাসী সে শাসন ব্যবস্থা দেখারও সুযোগ পেয়েছে। এ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের প্রেক্ষাপটে যেসব শাসন ব্যবস্থা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন মূলতঃ সেটি যুলুমতন্ত্রের নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

এক সময় পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক ব্লক ও ধনতান্ত্রিক ব্লকে বিভক্ত হয়েছিল। মূলত: দুই তন্ত্রেরই মূল ভিত্তি ছিল জড়বাদ ও বস্তুবাদ, যা মানুষে মানুষে হানাহানি দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি ছাড়া মানুষকে প্রকৃত শান্তি কোনদিন দিতে পারেনি আর পারবেও না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শোষণমূলক ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহই জন্ম দিয়েছিল সমাজতন্ত্রের। এ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা মানব জাতিকে চূড়ান্তভাবে এ সত্য উপলব্ধির সুযোগ করে দেয় যে, মানব রচিত কোন মতবাদ কোন তন্ত্র-মন্ত্রই মানুষের সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়, ইনসাফ, নিশ্চিত করতে পারবে না, অবসান ঘটাতে পারবে না যুলুম, শোষণ, নীপিড়ন, নির্যাতনের। সমাজতন্ত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মত্মবিলুপ্তির পর আবার বিশ্ব পুঁজিবাদের করাল গ্রাসে নিপতিত হোক মানব সভ্যতার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আজকের এক কেন্দ্রিক বিশ্বে নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার প্রতিষ্ঠার নামে নতুন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের নামে ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়েও জঘন্যভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এরফলে সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর দুর্ভোগ বাড়ছে। বিশেষভাবে গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ এক ফলে চরম অসহায় ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

বিশ্ব পরিস্থিতির এ পর্যায়ে জাতিসংঘ একটা অকার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মূলত এ প্রতিষ্ঠান এক কেন্দ্রিক বিশ্বের নিয়ামক শক্তির বাবারস্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে অতীতের দুই কেন্দ্রিক বিশ্বের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তৃতীয় শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাও মূলত এখন বিলুপ্ত প্রায়। মুসলিম উম্মাহকে হেফাযতের জন্য বিশ্বব্যাপী অর্থবহ ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য যে ও.আই.সি. গঠিত হয়েছিল **১৯৬৯**

সনে, তাও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সংকট মোকাবেলায় তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বর্তমান গোটা মুসলিম বিশ্ব যে আগ্রাসী শক্তির লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে তার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণে এ পরিস্থিতি উত্তরণের আপাতত কোন উপায় আছে বলেও মনে হয় না। তাই সঙ্গত কারণে মুসলিম বিশ্বে চলছে এক চরম হতাশা। মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে যুগটাকে যুলুমতন্ত্রের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এটাই সে যুগ। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। মুসলিম বিশ্বের ওপর এ যুলুম নির্যাতনের হাত সম্প্রসারিত হচ্ছে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে। এ অধ্যায়টি ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায় নয়। তাই আপাতঃ সৃষ্টিতে পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক না কেন, রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির প্রেক্ষাপটে অবশ্যই আসবে ইসলামের যুগ, খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাতের যুগ।

এ প্রসঙ্গে মতিউর রহমান বলেন, "মুসলিম দেশগুলো যখন এক এক করে ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, ঠিক তখনি পরাশক্তির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে অবৈধ ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক সুদূর প্রসারী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুসলিম বিশ্বের স্নায়ুকেন্দ্রে অবৈধ ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের দেশান্তরে বাধ্য করার জন্যই মূলত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সূচনা করা হয়েছে। অথচ, আজ এ সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন তথা গোঁটা মুসলিম সমাজকে। বর্তমান বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো মূলত। ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। সে সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার ওপরও তাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার, অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি শ্লোগানের আড়ালে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও নীল নকশা বাস্তবায়নের কূট কৌশল। মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিবিদ,

বুদ্ধিজীবী, আমলা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মগজ ধোলাই করে তারা মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী জাগরণ ঠেকাতে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধের অথবা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যথেষ্ঠ সফল হয়েছে। বেশ কিছু দেশে রাষ্ট্র শক্তির মাধ্যমে তারা ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ক্ষেত্রেও বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে যাতে আর কোথাও ইসলামী আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্যে তারা তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাকে ব্যাপকতর করেছে।

মতিউর রহমান, মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৩২-৩৩

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা ঔপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়েও করুণ এবং ভয়াবহ। ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল। আজকের দিনে ষাটের অধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যুলুমবাজ সন্ত্রাসবাদী ইয়াহুদিদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্যের সুযোগ নেই। এমনকি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সমূহেও জায়নবাদী, ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর খবরদারী ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিমদের স্বাধীন দেশে ইসলামের কথা বলতে, ইসলামের দাবী তুলতে অজানা অদৃশ্য শক্তির হাতের ইশারায় কৃত্রিম বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইয়াহুদী খ্রীষ্টান পরিচালিত এন. জি. ও.-দের অবাধ কার্যক্রমের সুযোগ দেয়া হলেও ইসলামী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে ন্যক্কারজনকভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত মুসলিম ধনী দেশগুলোর দানশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দানে পরিচালিত বদান্যতামূলক কাজের ওপরেও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার খবরদারী অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ইসলামী সংস্থাগুলো গরীব মুসলিম জনপদে মানবিক সাহায্য সহায়তা করতে গেলেও তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমাদের ভাষায় উগ্রপন্থী ধর্মীয় মৌলবাদের অবস্থান আবিষ্কারের জন্যে জঘন্যতম তথ্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জ ও নগ্ন হস্তক্ষেপ উদ্বেগ জনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার পরিণতি সুদূর প্রসারী হওয়ায় আজ প্রায় সর্বত্র মুসলিম জনপদ আতংকগ্রস্ত। এ পরিস্থিতিকে বলতে গেলে সকলেই উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে, সকলের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছ। কিন্তু মুখ খুলে সত্য কথাটি প্রকাশ করার সাহস-হিম্মত খুব কম লোকেরই আছে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবদেশে জ্ঞানপাপী একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী ছাড়া বাকি সকলেই এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ লালন করছে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তার প্রকাশও করছে। কিন্তু

কুর'আনে ঘোষিত মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে ইসলামের সঠিক দাওয়াত, নির্ভেজাল দাওয়াত, পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত উপস্থাপনের সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। আধুনিক বিশ্ব পরিস্থিতিকেই সামনে রেখে যৌক্তিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা তুলেধরার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হবে। সত্যের

সাক্ষ্য বলতে যা বুঝায় তার সার্থক বাস্তবায়নে আল্লাহর একদল বান্দাকে নিরলস ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর মৌলিক পরিচয় হলো, শেষ নবীর প্রতিনিধি হিসেবে তারা সকলেই দায়ীইলাল্লাহ। এ দায়ীইলাল্লাহর ভূমিকা পালনে সবাইকেই, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্যোগী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ দাওয়াতী তৎপরতাই ইসলামী শক্তির উৎস ও মুসলিম উম্মাহর উত্থানের পথ প্রশস্তকারী।

মতিউর রহমান বলেন, "মুসলিমগণের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও সুখকর নয়। বাইরের শক্তির সৃষ্ট পরিস্থিতির আকার আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরো ভয়াবহ। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে যারা রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে বিবেচিত তাদের মধ্যে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইসলামী আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতা এবং পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ধঅনুকরণ প্রবণতা। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ ও ক্ষমতায় টিকে থাকা সহ বিভিন্নমুখী সুযোগ-সুবিধা ভোগের মানসিকতা মূলত ইসলামের চিহ্নিত দুশমনের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের হাতকে এভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের মুসলিমগণের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অব্যাহত প্রচেষ্টা এ পরিস্থতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তার সাথে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে এক শ্রেণীর আলেমদের অযৌক্তিক মতপার্থক্য সংকীর্ণতা এবং রূপমঞ্জুকতা। এদের মধ্যে দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অপরিপক্কতা, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও কৌশল অনুধাবনে ব্যর্থতা ইসলামের দুশমনদের হাতকে শক্তিশালী করে চলেছে। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হয়, অনুসন্ধানে জানা গেছে কখনোকখনো ক্ষুদ্র স্বার্থে এঁরা ইসলামের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিরোধী পক্ষের ক্রীড়নকের ভূমিকাও পালন করছে। উম্মাহর প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে এদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞান বুদ্ধির যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী বিভিন্নমুখী তৎপরতা সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম ধারণাও আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থের ব্যাপারে এরা এতটাই অন্ধ যে, জাতীয় স্বার্থ ও উম্মাহর স্বার্থ নস্যাৎ করতেও তাদের মধ্যে কোন দ্বিধাবোধ সৃষ্টি হয় না। *২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩*
দ্বীনের উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কোন কোন মহলের একদেশদর্শিতা এবং ইসলামের মৌল শিক্ষার পরিপন্থী কার্যক্রম জনমনে বিভ্রান্তি, অনৈক্য ও নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে অনেকের উপস্থাপনা বিরক্তি ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ইসলাম বিরোধী বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বের হাতিয়ারকে শক্তি যোগায়। দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপের উপাদানও সরবরাহ করা হয়। মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে হক ও মোখলেছ দ্বীনদার ব্যক্তিদেরকে এ অবস্থার নিরসনে কার্যকর, সোচ্চার এবং বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা

পালনে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের মাঝে ইসলামের প্রতি আবেগ থাকলেও ইসলামের সঠিক ধারণা ও চেতনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধারণার অভাব সবচেয়ে বেশি। এমনকি এক শ্রেণীর ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও সঠিক ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। এসব লোক ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত চতুর্মুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই বাইরের সৃষ্ট সমস্যার মোকাবিলার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ এ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের মাঝে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত উপস্থাপন, ওলামায়ে কিরামের মধ্যকার মতপার্থক্যকে সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সর্বস্তরের জনমনে ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কার্যক্রম যুগপৎভাবে পরিপূর্ণ গুরুত্ব সহাকারে আঞ্জাম দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নয়ন ছাড়া বাইরের শক্তির মোকাবেলা করা কখনো বাস্তবসম্মত হতে পারে না।

পরিস্থিতির গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম পরিচয় বহনকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি। মুসলিমরা যেসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠএবং এ সুবাদে যেসব দেশ মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত তার সংখ্যাও যাটের অধিক। এ ছাড়া পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশে ও মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তার অনেকগুলো দেশেই আল্লাহ তা'আলা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও চলামান বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিমদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় মুসলিম দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়েও দ্রুত খারাপ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

অতি সম্প্রতি এবং নিকট অতীতের মধ্যপ্রাচ্য সংঘটিত ঘটনাসমূহ ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করছে। একটি তৈল সমৃদ্ধ সম্ভাবনায় আরব মুসলিম দেশ বিধর্মীদের সামরিক আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সেখানে আজ যা কিছু ঘটছে, তার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলেও মুসলিম দেশ সমূহে এর তেমন কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন মুসলিম দেশই এ পরিস্থিতির মোকাবেলায় সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে এবং চলাকালে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলেও বর্তমানে তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নিকট অতীতে ইরাকের কুয়েত আক্রমণকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের যেসব গুরুত্বপূর্ণ দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান পরিচালনার এবং নিজ সেনাবাহিনী রাখার সুযোগ গ্রহণ করে, তার সুদূর প্রসারী ভয়াবহ পরিণাম-পরিণতি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে কোথায় নিয়ে যাবে তা অনুমান করা কঠিন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টু-ইন টাওয়ার ধ্বংসের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে সারা দুনিয়াব্যাপি মুসলিমদের বিড়ম্বনা ও হয়রানির পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে। এ ঘটনাটি অবশ্যই নিন্দনীয়। মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে এর নিন্দা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ ঘটনার আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ ঘটনার সূত্র ধরেই আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, লিবিয়া ও ইরাকের মুসলিম জনপদ ইতিহাসের জঘন্যতম যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ পরিস্থিতি আর কত দূর গড়াবে, কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে কেউ জানে না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি বড় রকমের ভয়াবহ সংকটের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। অথচ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা

আছে বলে মনে হয় না। হয়তো তারা এ বিষয়টি আদৌ উপলব্ধি করতে পারছেন না, নতুবা তারা ধরেই নিয়েছেন এ মুহূর্তে তাদের করার কিছুই নেই।

চলমান এ বিশ্বপরিস্থিতি শুধু মুসলিমগণের জন্যই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে বিষয়টিকে এতোটা সীমাবদ্ধভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। এর পরিণতিতে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সার্বিকভাবে বিপর্যস্ত হবে মানবতা, মনুষ্যত্ব। অতএব মানবতা মনুষ্যত্বের এ ক্রান্তিকালে উত্তরণের জন্য বিশ্ববিবেককে জেগে ওঠতে হবে। মতিউর রহমান বলেন, "বিশ্ব-বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য বিবেকবান কিছু মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ অগ্রণী ভূমিকা পালনের মূল দায়িত্ব তাদের, যারা মুসলিম পরিচয় বহন করছে। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইউরোপ আমেরিকার মত দেশে মানুষের জাগ্রত বিবেকের যৎকিঞ্চিত প্রকাশ ঘটলেও মুসলিম বিশ্বে এর কোন প্রকাশ এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। অথচ জাতি হিসেবে বা উম্মাহ হিসেবে মানবতা ও মনুষত্যের এ দুর্দিনে মুসলিমদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মুসলিম উম্মাহর মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব পালনে অনীহা এবং ব্যর্থতাই মুসলিম উম্মাহর এ অসহায় অবস্থার জন্ম দিয়েছে। এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্যই নয় বরং গোটা মানব জাতির জন্য একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতি উত্তরণের স্বার্থে মুসলিম উম্মাহকে তার আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে হবে এবং সে সাথে উম্মাহ হিসেবে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। "

. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১*

পাশ্চাত্য নেতৃত্ব ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর মুসলিমদের পর পাশ্চাত্যের সে সব জাতিগোষ্ঠী নিজেদের হাতে তুলে নেয় যাদের কাছে প্রথম থেকেই হিকমতে ইলাহীর কোন পুঁজি ও সহীহ-শুদ্ধ ইলম-এর কোন স্বচ্ছসুন্দর ঝর্ণাধারা ছিল না। নবুওয়্যাতের আলোক-শিখা সেখানে মূলত পৌছেই নি, পৌছতে পারেনি। হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষামালার আলোক-শিখা যা সেখানে পৌঁছেছিল তা বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিবৃতির অন্ধকার আবর্তে হারিয়ে যায়। তারা সে আসমানী আলোর শূন্য স্থান রোম ও গ্রীসের দফতরে রক্ষিত অন্ধকার দ্বারা পূরণ করে। ইন্দ্রিয় পূজা, আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরত্ব, ভোগ-বিলাসপ্রবণতা, স্বদেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি, সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গ্রীস থেকে এবং ঈমানী দুর্বলতা, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, শক্তি সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণা ও সাম্রাজ্যবাদের প্রেতাত্মা রোম থেকে স্থানান্তরিত হয়। বৈরাগ্যবাদের পাগলামি বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গির্জাধিপতিদের ভোগ-বিলাস ও দুনিয়াদারী ধর্মাধিকারীদের প্রতি মানুষের অনাস্থা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। সরকার ও গির্জার মধ্যকার টানাটানি ও টানাপোড়েন জাতীয় মেযাজের মধ্যে বিদ্রোহ ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে।

অন্যদিকে জীবনের সঠিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন ও বিশ্বজয়ী কোন পয়গাম না থাকায় আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, পরিণত হয় জাতীয় বৃত্তি ও পেশায়। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "জাতীয় জীবন স্থায়ী রাখবার জন্য অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভীতির আবেগ প্রকাশ পায় এবং একদিকে সমগ্র প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে অভ্যন্তরীণ জাতীয়তার সীমারেখা গোটা পাশ্চাত্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাঘরে রূপ দেয় এবং এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর মাঝে একটি সীমারেখা টেনে দেয়। এর বাইরে যে মানুষ থাকতে পারে তার কল্পনাও করা যেত না। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকেই দাস বিক্রির এক বাজার এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুনিয়াটাকে কামারের চুলা বানিয়ে দেয় যেখানে সব সময় আগুনের খেলা চলে, লোহা উত্তপ্ত করে ও পিটিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানানো হয়। *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫*

এসব ধর্মহীন জাতিগোষ্ঠীর রাজত্বকালে মানুষ সে ধর্মীয় অনুভূতি থেকেও মাহরুম হতে থাকে যা অপরাপর মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে প্রাচ্যের হাজারো বছরের জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহ প্রাপ্তির আকাঙ্খার সাধারণ রুচির স্কুলে জাগতিক কামনার ব্যাধি বাসা বাঁধে। আচার-ব্যবহার, মৌলিক ও সত্যিকার মানবিক গুনাবলী ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিরাট রকমের অধঃপতন দেখা দেয়। মোটকথা, লোহা-লক্কড় ও ধাতব পদার্থের সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটে আর মনুষ্যত্বের ঘটে সার্বিক অধঃপতন।

বিশ্বব্যাপী জাহিলিয়াত

এ সময় এমন কোন শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা দল সাধারণ মানুষের সামনে নেই যে, এ সব পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আকীদাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্য পোষণ করে এবং তাদের জাহিলী দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার বিরোধী। এমন জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল এ মুহূর্তে না ইউরোপে আছে আর না আছে এশিয়া কিংবা আফ্রিকায়। ইউরোপের জার্মান হোক কিংবা এশিয়া মহাদেশের কোন জাপানী অথবা ভারতীয় অধিবাসী, সকলেই এ জাহেলী দর্শন ও এ বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার সমর্থক ও ভক্ত বিশ্বাসী। আর তা না হলেও বিশ্বাসী সমর্থকে পরিণত হতে যাচ্ছে। থাকলো সে সব রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ যা এ মুহূর্তে বিভিন্ন দর্শন কিংবা যুদ্ধের আকারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা শুধুই এ নিয়ে যে, এ বস্তুপূজার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে?

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "এক জাতির পৌরুষ ও জাতীয় মর্যাদাবোধ এটা সইতে রাজী নয়, অন্য জাতি দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার বুকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে, জীবন-সমস্যা ও সমূহ কল্যাণ থেকে ফায়দা লুটবে এবং বিশ্বের বাজার ও নয়া নয়া উপনিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসবে, অথচ শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সে কারোর পেছনে নয় কিংবা কারোর চেয়ে কম নয়। থাকলো এ যে, সে স্বয়ং অপর কোন মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে এবং অন্য জাতিগোষ্ঠী গুলোকে নিয়ে যেতে চায়, পৃথিবীর বুকে ন্যায়নীতি, শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করতে চায় এবং দুনিয়ার গতিমুখ ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার দিক থেকে ঘুরিয়ে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিকে, চরিত্রহীনতা থেকে আখলাক-চরিত্রের দিকে এবং নফস-পরস্তী ও শয়তান পূজার দিক থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর দিকে পাল্টে দিতে চায়। তা এ গরীব এর দাবিদার যেমন নয়, তেমনি কখনো এর আকাঙ্ক্ষীও নয়।

প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

অমুসলিমদের ও মুসলিমগণের জাহিলিয়াতের মিত্র

জাহিলিয়াতের প্রাচীন ও বংশগতসূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমগণ এ যুগে দুনিয়ার অনেক প্রান্তেই জাহিলিয়াতের মিত্রে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে এবং দুনিয়ার কোন কোন অংশে তারা ঐ সব পাশ্চাত্য জাহিলী জাতিগোষ্ঠীর নিমিত্ত স্বেচ্ছা প্রণোদিত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং দিচ্ছে। জাহিলিয়াতের এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে যে, কোন কোন মুসলিম জাতি ও সাম্রাজ্য এবং কতকগুলো মুসলিম দল ঐ সব জাতিগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যকে নিজেদের সাহায্যকারী, সমর্থক ও অভিভাবক এবং সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী মনে করতে শুরু করেছে, যারা এ যুগে জাহিলী আন্দোলনের নিশান বরদার এবং যারা জাহিলিয়াতের মরা লাশে জীবনের নতুন প্রাণ স্পন্দনের সঞ্চার করেছে। সাধারণ মুসলিমগণ দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের ধারণাই পরিত্যাগ করেছে এবং মুসলিম জনতার নেতা হবার পরিবর্তে জাহিলিয়াতের কাফেলার সর্দার হবার ধারণাতেই তুষ্ট এবং এতেই তারা গর্ব অনুভব করছে।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "সাধারণ মুসলিমগণের মধ্যে পাশ্চাত্যের মধ্যে পাশ্চাত্যের জাহিলী নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণ এভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যেভাবে গাছের শিরা-উপশিরার মধ্যে পানি ও তারের মধ্যে বিদ্যুৎ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ তার পরিপূর্ণ শান-শওকতের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার অন্ধ আনুগত্য জীবনের এমন এক পিপাসা যা মেটার নয় এবং এমন এক ক্ষুধা যা দূর হবার নয়, সৃষ্টি হতে চলেছে এমন এক জাতির মধ্যে যার কাছে পারলৌকিক জীবনই আসল জীবন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রভাবে পরকালের ধারণা প্রতিদিনই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলছে এবং ইহলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মান, গৌরব, গর্ব, অহংকার ও উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতায়, সমুন্নতি ও নেতৃত্ব লাভের প্রয়াসে উৎসাহী ও প্রগতিশীল মুসলিমরা ইউরোপের উন্নত লোকদের পদাংঙ্ক অনুসারী। নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তাকে প্রাধান্য দেবার ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বন্ধুপূজারী জাতিগুলোর অনুসরণে বাহ্যিক ও ফাঁকা প্রদর্শনীর বাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের গোলামী, শক্তি ও সম্পদের সামনে মস্তকাবনতি ও শাহপরস্তীর ক্ষেত্রে কোথাও এ তৌহীদবাদী ও মুজাহিদ উম্মাহকে অংশীবাদী কাফের মুশরিক ও দাসসুলভ মনেবৃত্তিসম্পন্ন জাতিগুলো থেকে খুব বেশি আলাদা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ

নব্য সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বা আগ্রাসন যা আফগানিস্তান ও ইরাকে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক আইনে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অধিকার ছিল না আফগানিস্তান আক্রমণ করার। মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যারা কোনো প্রকার আন্তর্জাতিক আইন মানে না। তারা ইরাক দখল করে নিয়েছে। তারা চাচ্ছে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় তাদের আদেশ নিষেধকেই মেনে চলতে হবে, তাদের ইচ্ছামতো চলতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর মাধ্যমেও তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে নিবিড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কৌশলের ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্ব ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ

মুসলিম বিশ্ব নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কবলে পতিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চটকদার স্লোগানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক দাসে পরিণত হয় তার সবরকম কৌশল উদ্ভাবন করেছে সাম্রাজ্যাবাদী শক্তি। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমনকি জাতিসঙ্ঘ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশকে উন্নয়নের নির্ভরশীল তত্ত্বে এর অনুসারীতে পরিণত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এম এ সাঈদ বলেন, "মুসলিম বিশ্ব গোটা বিশ্বের ষাট শতাংশ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কারণে শক্তিশালী করতে পারেনি। বিশ্বের মজুদ তেলের ৭৫%, গ্যাসের ৩৩% ফসফেটের ৭৫% টিনের ৬০% এবং ম্যাংগানিজের ৩৫% এর মালিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব আজও পশ্চাৎপদ। পাশ্চাত্যের তথা উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঞ্চিত মূলধন। মুসলমানগণের অর্থেই পশ্চিমারা আজ লাভবান হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদীরাই নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন শ্লোগান মাত্র। মূল কথা হচ্ছে, শক্তিশালী পাশ্চাত্যের পণ্য বিক্রি করা। ফ্রি ট্রেডের কথা বলে তারা এটি করছে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ পাশ্চাত্যের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করছে। এদের ষড়যন্ত্রেই মুসলিম বিশ্ব অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সচ্ছলতা ও উন্নতির ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। "

. এম এ সাঈদ, আত তারীখুল ইসলামী ওয়া তারীখু ইলমিল হাদীস (ঢাকা: আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৪), পৃ. ১৯৯

বুদ্ধিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ

বুদ্ধিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মুসলিম বিশ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বুদ্ধিভিত্তিকভাবে পাশ্চাত্য ইসলামকে সন্ত্রাসী বলে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের ওয়াল্ড ট্রেট সেন্টার, টুইন টাওয়ার ও নিউইয়র্কের পেন্টাগনে ভয়াবহ বিমান হামালার ঘটনায় কোনো কিছু প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যে মুসলিমগণ আক্রমণের শিকার। এখনো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি আসলে কে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটিয়েছে। মার্কিন সরকার একটি ফরমাল জুডিশিয়াল তদন্ত পর্যন্ত এখনো করেনি। বিচার বিভাগীয় কোনো কমিশন করেনি। তদন্ত না করে, কোর্টে প্রমাণ না করে মুসলিমগণের দায়ী করা হচ্ছে। টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করার একটি হাতিয়ার মাত্র। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের পোশাকে ইসলাম ও মুসলিমগণের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

অমুসলিমদের নানান চ্যালেঞ্জ:

সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে ফ্রান্সের মতো একটি দেশ আইন করে হিজাব নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোন পর্যায়ে যেতে পারে। তারা শালীনতাকে সহ্য করতে পারে না। তারা নগ্নতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের সংগ্রাম শালীনতার বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক সাংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলেই মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে হু হু করে বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত বিশেষ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরাট অংশ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের গোলামে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে অবস্থান করে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা নিয়োজিত করে রেখেছে, কেননা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি যুদ্ধ, যা মুসলিম দেশ সমূহের নতুন প্রজন্মের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসে চরম আঘাত হানছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের চ্যালেঞ্জ

আজ ইসলামী উম্মাহর প্রধানতম বাস্তব চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদিবাদ চক্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এ চক্র মুসলিম বিশ্বকে পদানত করে রাখার, দুর্বল করে রাখার, দমিয়ে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে। তারা যেকোন মূল্যে ইসলাম ও মুসলিম উত্থানকে রুখতে চায়। তাদের এ পদক্ষেপে তারা এতো বেশি উন্মুক্ত হয়ে আছে যে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে ইসলামকে ঠেকানোর প্রশ্ন জড়িত। সেখানে তাদের বিঘোষিত তথাকথিত গণতন্ত্র, মানবাধিকার কোন কিছুই জলাঞ্জলি দিতে পরোয়া করছে না। বসনিয়া, ফিলিস্থিন, আলজেরিয়া, মিসর ইত্যাদি ঘটনাএর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমা জগতের কর্তৃত্ব

এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিমগণের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীতে মুসলিমগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অমনযোগিতা ও পতন অন্যদিকে ইউরোপে আগরণের সূত্র ধরে পশ্চিমা জগত মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানের সূচনা করে। তারা বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে। গোটা দুনিয়া আজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এম এ সাঈদ বলেন, "বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিএ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব এদিক থেকে ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছে। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

প্রচার মিডিয়ার ওপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জ

বিশ্বব্যাপী প্রচার মিডিয়ার ওপর কর্তৃত্বস্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমা জগত তথ্য ও মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের এক ব্যাপক জাল বিস্তার করেছে। এরা তথ্য বিকৃতি ও তথ্য প্রচারে কাজ করেছে সুকৌশলে। এরা চালাচ্ছে নানা কায়দায় ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা। এরা নগ্নতা, অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী মানবজাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার ঘৃণ্য কাজটি করে যাচ্ছে। এরা নিয়ন্ত্রণ করেছে দুনিয়ার সবকটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ও টিভি নেটওয়ার্ক। ফলে তাদের উৎস থেকে মুসলিম বিশ্বকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে সংবাদ ও তথ্য। তাদের দেয়া তথ্য ও প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ। এ সম্পর্কে এম এ সাঈদ বলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম উম্মাহকে তথাকথিত মৌলবাদ টেররিস্ট বলে প্রচার চালিয়ে ইসলাম সম্পর্কে এক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও জাগরণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করে এরা বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার কৌশল গ্রহণ করছে। গ্রাহক, পৃ. ২০১

অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার

এম এ সাঈদ বলেন, "পৃথিবীতে আগেও অশ্লীলতা ছিল। কিন্তু অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফী আজকের মতো কখনো গণরূপ পায়নি। অশ্লীলতা ও পর্ণোগ্রাফিকে আজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কাব্য সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প চারুকলা প্রতিটি শিল্পকর্মের মাধ্যমে জীবনবিমুখ বস্তুবাদী, ভোগাবাদী পর্ণোগ্রাফী দর্শনের প্রসার ঘটানো হয়েয়। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সিনেমা ও টিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। পাংস হচ্ছে যুব চরিত্র, বাড়ছে মাদকাশক্তি, ছড়াচ্ছে মরণঘাতি রোগ। ধর্ম বিমুখবিকৃত লেখকরা আর্টের নামে ধংস করে দিচ্ছে সমাজকে, মানবতাকে। আর এসবকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমে। এসব হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের পথে তীর বাধা। বর্তমান যুগে অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।*প্রাজক, পৃ. ২০১*

বিশ্বব্যাপী বাজার দখল ও পুঁজিবাদের আধিপত্য

মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র সব সময়ই মুসলিম বিশ্বের বাজার দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। কমিউনিজমের পতনের পর এ প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। এখন চলছে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তরের চেষ্টা। তারা ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্বের বিরাট বাজার দখল করে নিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব আজ সামান্য পণ্যের জন্য ও তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। অধিকন্তু পুঁজিবাদের বিপুল শক্তি ও উপকরণ ব্যয় হচ্ছে ইসলামের উথ্থান ঠেকাবার জন্য।

শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি প্রকট সমস্যা, মুসলিম বিশ্বকে ইসলামের আলোকে উন্নত ধরনের যুগোপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, কেননা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের প্রয়োজন পূরণ করছে না, এজন্য তা সংস্কার করতে হবে, আলেমদেরকে এ ব্যাপারে ইসলামের কথা, দেশের কথা চিন্তা করে সংস্কারের কাজে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে।

সমস্যাসমূহ:

চরমপন্থার সমস্যা

মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী সমস্যা হলো চরমপন্থার সমস্যা। কেননা চরমপন্থা ইসলামের পথ নয়, ইসলাম মধ্যম পন্থায় বিশ্বাসী, অতীতকালে মুসলিমগণের মধ্যে খারেজীদের উদ্ভব হয়েছিল, তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক চরমপন্থী ছিল, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চরমপন্থী ছিল। তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করে, মুসলিমগণকে এ ধরনের চরমপন্থা থেকে রক্ষা করতে হবে, মুসলিম উম্মতের জন্য কল্যাণ হচ্ছে চরমপন্থা পরিহার করা।

কারযাভির মতো মুসলিম বিশ্বের প্রধান চিন্তাবিদরা মনে করেন মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন রকম চরমপন্থা বা উগ্রতা রয়েছে। এদের স্বভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এরা একে অন্যকে সব সময় অভিযুক্ত করে। নিজের মতের বাইরে শুনতে চায় না। ইসলামের স্বভাব মধ্যপন্থা, চরমপন্থা নয়। চরমপন্থার ক্ষতি মুসলিমগণ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। এটি দূর করা খুবই প্রয়োজন।

যেখানে মুসলিম উম্মাহর ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা জরুরী সেখানে সময় কোথায় যে মুসলিমরা গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করবে। যেখানে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্যতার সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা-সেখানে কার দাড়ি কতো বড় সেটি কোনো বিষয় হতে পারে না। কিছু লোক মুসলিমগণের প্রধান বিষয়সমূহের পরিবর্তে ছোট বিষয়গুলোকেই বেশি করে তুলে ধরতে থাকে। কিন্তু এটি মুসলিম উম্মাহকে বুঝতে হবে যে একটি বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাবার পর সেটির বিন্যাস বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে আগে বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। তেমনিভাবে যেখানে ইসলাম এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলামের মূল কাজ করার পরই অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, যদি তা জরুরি মনে করা হয়। আর ততটুকু করা যেতে পারে যতটুকু ইসলাম জরুরি মনে করেছে। কিন্তু এখানে বাস্তব ইসলামের মূল

স্পিরিটটিই নেই। সেটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় কি সেসব মারজিনাল বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়?

ইসলামের একটি অন্যতম বিষয় হলো বিভিন্ন রকম চরমপন্থা যা ইসলামকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যারা চরমপন্থি তাদের অবস্থান কারোর হয় এ পাশে নয় ঐ পাশে, যে কোনো এক প্রান্তে। ফলে তারা কখনো সমন্বয় করতে জানে না। সমন্বয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সমন্বয় করা তখনই সম্ভব যখন মানুষ মডারেট হয়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। যখন তাঁরা একে অন্যের সাথে কথা বলে, আলাপ করে, একজন আরেকজনের কথা শোনে- তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ করে। কিন্তু কট্টরপন্থা হলো উম্মতের মধ্যে এমন অবস্থান সৃষ্টি করা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে না পারে।

বর্তমান পুঁজিবাদী ও বস্তুবাদী বিশ্বের অর্থ রোজগারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মারণাস্ত্রের ব্যবসা। সংঘাত ও যুদ্ধ ছাড়া এ ব্যবসা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই তারা অস্ত্র ব্যবসার জন্য সার্বক্ষণিক নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কখনো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে, কখনো স্বৈরাচার অপসারণের নামে, কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে, কখনো সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনের নামে-নানা দল-উপদল সৃষ্টি করে তাদের অস্ত্র ব্যবসার বাজারকে চাঙ্গা করে তুলে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে যেসব ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত পরিচালিত হচ্ছে এগুলোও মূলত তাদেরই সুদূরপ্রসারী নীল নকশা।

অস্ত্র ব্যবসার জন্য মুসলিম বিশ্বে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য হচ্ছে একটি উর্বর ক্ষেত্র। এখানে যদি সংঘাত ও সংঘর্ষ জিইয়ে রাখা যায় তাহলে দ্বিমুখী লাভ। প্রথমটি হচ্ছে-তেলসম্পদ নিজেদের দখলে নেয়া, তেলের অর্থ দ্বারা সংঘাত জিইয়ে রাখা এবং তেলসম্পদ নিঃশেষ। করে মুসলিমগণের দেওলিয়া বানানো এবং মারণাস্ত্র বিক্রির অর্থ দ্বারা নিজেদের সম্পদশালী করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে-ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখে মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে জাতি হিসেবে তাদের দুর্বল করে দেয়া।

এ সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, 'বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে আইএস নামক যে জঙ্গীবাদী গোষ্ঠী মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা তছনছ করে দিচ্ছে এদেরকেও পুঁজিবাদী বিশ্ব সৃষ্টি করেছে বলে বিভিন্ন মিডিয়ার সংবাদ থেকে জানা যায়। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকের সচিত্র অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, "আইএস প্রতিষ্ঠার মূল হোতা হচ্ছে ইসরাইল। ইসলামী স্টেটের স্বঘোষিত খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী' তিনি মুসলিম নন। তার আসল নাম 'আকা ইলিয়ট শিমন'-একজন ইহুদি। আমেরিকান ফ্রি প্রেসের প্রতিবেদনে জানা যায়, ইহুদি পিতা-মাতার কোলে জন্ম নেন

বাগদাদী। এডওয়ার্ড স্নোডেনের ফাঁস করা তথ্যানুযায়ী বাগদাদীকে টানা ১ বছর সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় 'মোসাদ'। একই সময়ে আরবী ভাষা ও ইসলামী শরীয়ার উপর কোর্স করেন বাগদাদী। এ সময় বাগদাদী ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ ইবনে ইবরাহীম আল বদরী নাম ধারণ করেন।

তবে মোসাদ অত্যন্ত কৌশলে মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদী সম্পর্কে এ পরিচয় ছাড়িয়েছে যে, বাগদাদী ১৯৭১ সালের ২৮ জুলাই ইরাকের সামারায় জন্মগ্রহণ করেন, বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ-এ মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এভাবেই সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী সংগঠন হিসেবে পরিচিত আইএস-এর উত্থান। হয় ২০১৩ সালের জুনে। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর পরিকল্পনায় আইএস তৈরি করা হয়েছে। ইসরাইলী এ সংস্থাটির কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে আইএস-এর সকল শীর্ষস্থানীয় নেতারা। মোসাদের প্রশিক্ষণ কৌশলই আইএস তাদের যুদ্ধে ব্যবহার করছে। তারা অত্যন্ত কৌশলে বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলিম তরুণদের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা ছড়িয়ে দলে ভিড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাচ্ছে এবং ইসলামকে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে পরিচিত করানোর জন্য পৃথিবীর নানা দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। অন্য একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "আইএস-এর মাধ্যমে মুসলিমদের ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক সহিংসতা ঘটিয়ে ভূখণ্ড বাড়াতে চায় ইসরাইল। "

সম্প্রতি প্যারিসের ৬টি স্থানে একযোগে যে জঙ্গী হামলা হয় এর দায়িত্ব আইএস তাদের নিজেদের কাজ বলে স্বীকার করে নেয়। প্যারিসে এ ভয়াবহ হামলার পর একই সাথে কিউবার সাবেক নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ সংবাদ সম্মেলন করে দু'জনেই বলছেন যে, আইএস ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের আগাসী অস্ত্র। বিশ্বব্যাপী নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইএস নামের এই ভয়ানক কাল সাপ মাঠে নামিয়েছে তারা। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় যে, "ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও সন্ত্রাসকে পুঁজি করে সন্ত্রাসবাদ শব্দটির সংযোগ, মুসলিম দেশগুলোতে আইএস নানা ধরনের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু আন্তর্জাতিক মিডিয়া সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক খুঁজে নিতেই বেশি মরিয়া, বাস্তবতা হচ্ছে-বিশ্বের প্রতিটি সভ্য দেশ, তাদের সরকার প্রধান ও শান্তিপ্রিয় মানুষ বারবারই সন্ত্রাসবাদ ও নির্দিষ্ট কোনো ধর্মকে এক করে দেখে না। সন্ত্রাসের ধর্ম একটাই-সন্ত্রাসবাদ।

মুসলিম দেশসমূহ থেকে ইসলামের নির্বাসন

একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণের অভাবে বিকৃতি, দুর্নীতি ও মিথ্যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্ক্সবাদের ও ধর্মনিরপেক্ষতার ছোবলে মুসলিম সমাজ বিপর্যস্ত। আধুনিক "ক্রুসেডাররা" ক্লাব, থিয়েটার, অশ্লীলতা, ছায়াছবি, নাচ-গান, মদ তথা সর্বক্ষেত্রে মুসলিমগণকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। সংবাদপত্রে তারা অনুপ্রবেশের জাল বিস্তার করছে। রাষ্ট্রঘাটে অর্ধোলঙ্গ নেশাসক্ত নারীদের অবাধে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে মুসলিম সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার সুগভীর চক্রান্তের ফল।

এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, "মুসলিম দেশগুলোতে এমন সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ অথচ ভাব দেখানো হয় উম্মাহর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ উজ্জীবিত করাই এর লক্ষ্য। কিন্তু এসব আইনের উৎস শরীয়ত নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই-এসব আইন আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে সিদ্ধ করে আর আল্লাহ যা সিদ্ধ করেছেন তাকে অসিদ্ধ ঘোষণা করে। আর এসব তথাকথিত আধুনিক আইন সব রকম দুর্নীতি ও অনাচারকে প্রশ্রয় দেয়। অন্যদিকে শাসকদের কার্যকলাপও হতাশাব্যঞ্জক। তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে সন্ধি করে আর ইসলাম ও ইসলামপ্রিয় মানুষকে দলন করে। কদাচিৎ এদের মুখে ইসলামের কথা শোনা যায় নিছক ধর্মীয় উপলক্ষ্য ছাড়া তাও আবার সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে।"

মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আরো করুণ। তরুণরা তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের কি অসহনীয় বৈষম্য। কেউ কোনোভাবে জীবন ধারণ করছে, এমনকি ঔষধপথ্যও সংগ্রহ করতে পারছে না কিংবা মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই। অন্যদিকে বিত্তবানরা লাখ লাখ টাকা মদ ও নারীর পেছনে ঢালছে, বড় বড় প্রাসাদে বাস করছে কিংবা অনেক সময় খালিই রেখে দিচ্ছে। বিদেশী ব্যাংকে তারা কোটি কোটি ডলার গোপনে সঞ্চয় করছে। তারা তেলের টাকা অপহরণ, পাশ্চাত্যের সাথে সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে লেনদেন করে বিত্তের পাহাড় গড়ছে। আর এ অর্থ তারা জুয়া ও নারীর পিছনে অকাতরে ব্যয় করছে। এর একটি অংশও যদি তারা দরিদ্র মানুষের জন্যে দান করতো তাহলে হাজার হাজার মানুষের অন্ন ও আশ্রয়ের সংস্থান হতো। অথচ এ সুবিধাভোগী শ্রেণী দিনে দুপুরে ডাকাতির মতো জনগণের সম্পত্তি অপহরণ করে চলেছে। সুদ, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি তো আছেই কিন্তু এদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করার কেউ নেই।

আইনের হাত থেকে বাঁচার রাস্তাও তাদের জন্য সহজ। সুতরাং এ নিদারুণ পরিস্থিতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে, এতে আর সন্দেহ কি। আর এ সুযোগের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকে সর্বনাশা মার্ক্সবাদীরা। তখন তারা বিকল্প হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামের কাজ জারি করে দেয়।

ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম শুধু নিজেকে সৎ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয় না, অন্যকেও সংশোধনের তাগিদ দেয়। মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টাকে এ কারণে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে তার সামর্থ্য অনযায়ী ইসলাম পচারের কাজে অংশ নিতে হবে। এ জন্যে কর'আনে বলা হয়েছে:

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في ذلك هو أعلم بمن ضل عن سبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ, 'আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহলান করেন-জানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করেন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" **১৬:১২৫**

রাসুলুল্লাহ (সা.) ও প্রত্যেক সাহাবী ছিলেন ইসলাম প্রচারক। কুর'আন আরো বলেছে:

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن المعنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِن المشركين

অর্থাৎ, 'বলে দিন এ আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।'**১২:১০৮**

দাওয়াতী কাজে ভীতিপ্রদান ও বাধা সৃষ্টিও চরমপন্থী মনোভাব সৃষ্টির প্রধান কারণ। বিশেষ করে যখন ধর্ম নিরপেক্ষতা ও মার্ক্সবাদ প্রচারে কোনো বাধা দেয়া হয় না; বরং সকল সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয় তখন এটাকে কিছুতেই সহজভাবে মেনে নেয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ

অযৌক্তিক এ কারণে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী বিপ্লবের কাজে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই, কোন সরকারেরও থাকতে পারে না। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতেই ইসলামকে পরিপূর্ণ বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে গিয়ে সেন্সরশীপ ও নানারকম দলনের শিকার হতে হচ্ছে। সেখানে কেবল দরবেশ মার্কা ইসলাম ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেয়া হয়। এদের ইসলামের চেহারা হচ্ছে পশ্চাৎপদতা ও অবজ্ঞায় এবং আচার- অনুষ্ঠান, বিদ'আতী কাজ কর্ম, শাসকতোষণ এবং শাসকদের গদী বহাল রাখার দোয়ার মধ্যে সীমিত। আর এভাবে দুর্নীতিপরায়ণ শাসকরাও এ ধরণের ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় অতি উৎসাহী। এভাবে অন্যায় অবিচার শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদকে তারা সাবোটাজ করার অপচেষ্টা চালায়। মার্ক্স সম্ভবত এ অর্থে দাবী করেছিলেন, "ধর্ম জনগণের জন্য আপিম।কিন্তু কুর'আনুল কারীম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন যে ইসলাম রেখে গেছেন তা হচ্ছে সত্য, শক্তি, সম্মান মর্যাদা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জিহাদের প্রতিভূ। আর শাসকরা এ ইসলামকে সয়লায় কারণ তাদের অনাচার অবিচারে বিরুদ্ধে জানি তখন বিদ্রোহ দেখা দেয়।"

আল্লাহ তার অনুসারীদেরকে বলেন:

" তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাকে ভয় করতো,আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতো না।"

শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন

মুসলিম উম্মাহর অবস্থা আজ খুব একটা ভাল নয়। এখন পর্যন্ত আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলিমগণের মধ্যে উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। এখানে বিদ'আত প্রচলিত আছে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় শিরক প্রবেশ করছে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ গভীর অজ্ঞতা, অনেক বিদ'আত এবং শিরকে ডুবে আছে। বস্তুগতভাবে বললে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই অশিক্ষা ও দারিদ্রতা বিরাজমান। এছাড়া উন্নয়নের দিক থেকেও তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কিছু দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি খুব খারাপ, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও খুব দুর্বল।

অমুসলিমদের অপতৎপরতা রোধে করণীয়:

দুঃখজনকভাবে মুসলিমগণের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ফিরকা রয়েছে যারা মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রচার-প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে অসচেতন এসব ব্যক্তিত্ব ও গ্রুপ তাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইসলামের শত্রুদের সেবা করে যাচ্ছেন। পাশ্চাত্যের উপনিবেশ কামীরাই যে ইসলামের আসল শত্রু এবং তারা যে মুসলিমগণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে সে ব্যাপারে এসব ব্যক্তিত্ব ও গ্রুপের যেন কিছুই করণীয় নেই বা এ ব্যাপারে তারা যেন গভীর ঘুমে অচেতন। মুসলিম বিশ্বের আদর্শিক অবস্থা, তাদের বস্তুগত অবস্থা যখন এই, তখন একটি শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলার বিকল্প নেই। কারণ মুসলিম উম্মাহ এমন একটি জাতি, যারা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। মুসলিমগণ যদি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত না হয়, তবে অমুসলিমগণের শাসনই চলতে থাকবে তাদের ওপর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তারা বিলীন হয়ে যাবে অমুসলিমগণের মধ্যে। মুসলিম উম্মাহ মানেই ইসলামি আর্দশের বাহক। আর ইসলামের আদর্শ কেবল তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে, যখন মুসলিমগণ হবে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে কেবল ফিতনা আর বিপর্যয়ই সৃষ্টি করবে। বিচ্ছিন্নতার সুযোগে যে কোনো পরাশক্তি মুসলিমদেরকে ফিতনা এবং গুমরাহিতে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। আর বিচ্ছিন্নতার কারণে এ ধরণের ফিতনা তারা প্রতিরোধও করতে পারবে না। ইতিহাস স্বাক্ষী, বিচ্ছিন্নতার যুগে মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল? ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় তখনই সম্ভব, যখন ইসলামি উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে এর জন্যে চালিয়ে যাবে প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সংগ্রাম।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ থাকা অনিবার্য বা ফরয করে দিয়েছেন। তাছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার বিকল্প নেই।

জামাতবদ্ধতা স্বয়ং এক বিরাট শক্তি। কোনো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে সহজে কেউ পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন মাধ্যমেই কোনো জাতি হতে পারে বিজয়ী, লাভ করতে পারে সম্মান, সাফল্য ও উন্নতি। যে কোনো শত্রু এমন জাতিকে সমীহ করে চলতে বাধ্য। এমন জাতিকে পর্যদুস্ত করা সহজ কথা নয়। এমনকি তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করারও কেউ থাকে না। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হবে 'হাকলুল্লাহ বা আল্লাহর রশি'। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব আল কুর'আন ও সুন্নাতে রাসূল (স.)-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এ দু'টির পূর্ণ অনুসরণ তাদেরকে করতে হবে। সবাই ভাই ভাই হিসেবে একযোগে দীনের এ ভিত্তিদ্বয়ের আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। সবাই পরস্পরকে এ দুই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সহযোগিতা করবে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

واعتصموا بحبل اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" ৩:১০৩

ঈমানই মুসলিম বিশ্বের শক্তি

ইসলাম হল মুসলিম বিশ্বের জাতীয়তা, রাসুলুল্লাহ (স.) হল তার ঈমাম ও নেতা আর ঈমান হল তার শক্তির উৎস ও ভাণ্ডার যার ওপর ভরসা করে সে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মুকাবিলা করেছে এবং বিজয়ী হয়েছে। তার শক্তির রহস্য, তার কার্যকর অস্ত্র ও সক্ষম হাতিয়ার কাল যা ছিল, আজ তাই আছে যা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এবং অন্যদের পর্যন্ত নিজের পয়গাম পৌছাতে পারে।

মুসলিম জাহানকে যদি কমুনিজম ও ইয়াহুদিবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় কিংবা অন্য কোন শত্রর সঙ্গে মুকাবিলা করতে হয় তাহলে সে সেই সম্পদের ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে পারে না যা ব্রিটেন তাঁকে দেয় কিংবা আমেরিকা তাঁকে খয়রাত করে কিংবা পেট্রোলের বিনিময়ে সে লাভ করে। সে তার শত্রুর মুকাবিলা কেবল সে ঈমান, সে অর্থপূর্ণ শক্তি, সে রুহ তথা প্রাণসত্তা ও স্পিরিটকে সাথে নিয়েই লড়তে পারে যে স্পিরিটের সাথে কখনো তারা একই সঙ্গে রোম এবং পারস্য সরকারকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং জয় লাভ করেছিল। সে সেই হৃদয় নিয়ে যুদ্ধ করতে পাওে না যে জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। সে শরীর নিয়ে মোকাবিলা করতে পারে না যা আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত। সে বুদ্ধি-বোধ নিয়েও মুকাবিলা করতে পারে না যাতে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘুণ লেগেছে এবং যার চিন্তা ও চেতনা কামনা ও বাসনা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষরত। তাকে মনে রাখতে হবে দুর্বল ঈমান, সন্দেহযুক্ত দিল ও ময়দানের সঙ্গ পরিত্যাগকারি শক্তি সাথে

নিয়ে আর যা-ই হোক, যুদ্ধের ময়দান কখনো জেতা যায় না। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "মুসলিমগণের নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিবর্গের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, তারা মুসলিম ফৌজ, কৃষক, ব্যবসায়ী ও জনগণের প্রতিটি স্তরে ঈমানের বিজ বপন করুন, চারা রোপণ করুন। তাদের মধ্যে জিহাদি প্রেরণা, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ এবং বাহ্যিক ব্যসন-ভূষণ ও সাজসজ্জার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করুন। তাদেরকে প্রবৃত্তি জাত কামনা বাসনা ও জীবনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা, আল্লাহর পথে বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করা এবং হাসিমুখে মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও মৃত্যুর মুখে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সবক দিন।

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন, রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনায় যারা নিয়োজিত আছেন, আর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ যাঁদের হাতে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সঠিক ধারণা লাভের তেমন একটা সুযোগ তাদের হয়নি। প্রধানত মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। আলেম উলামাগণের সাথে এদের উঠাবসা, মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার পরিবেশও তেমন নেই। বরং ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোল্লা ও মিস্টার তৈরির যে সুদূর প্রসারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তার অবসানতো হয়নি; বরং উত্তরোত্তর এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক শ্রেণীর আলেমদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার অক্ষমতা ও আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতি সহানুভূতিহীন কটাক্ষ করার প্রবণতা এ বিভেদকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে উম্মাহর অভিভাবক আলেম সমাজকে অগ্রণী ও উদ্যেগী ভূমিকা পালন করতে হবে। আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতিপক্ষ বিবেচনা না করে, তাদেরকে সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার বিশেষ উদ্যেগী ভূমিকা নিয়ে আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। উম্মাহর সমস্যা নিরসনের জন্য আধুনিক শিক্ষিতদের নেতৃত্ব যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি বর্তমান অবস্থায় শুধু আলেম সমাজের পক্ষেও কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই। জাতির মধ্যকার বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে মোল্লা ও মিস্টার এ পার্থক্য মুছে ফেলে আলেম-ওলামা এবং আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে অর্থবহ ঐক্য, সংহতি, সহযোগিতা বর্তমান সময়ের দাবী। কুর'আন হাদীস ভিত্তিক ইসলামের মৌলিক আহ্বানের ক্ষেত্রে জ্ঞানী আধুনিক শিক্ষিতদের আলেম ওলামার সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন

আছে। তেমনি আধুনিক যুগের রাষ্ট্র প্রশাসন ও আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আলেম সমাজকে আধুনিক শিক্ষিতদের কাছ থেকে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যথেষ্ট জানার ও বুঝার আছে। তাই উপনিবেশবাদী শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল স্বরূপ সৃষ্ট আধুনিক শিক্ষিত এবং আলেম সমাজের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা বোধ ছাড়াও নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করে সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে পরস্পরের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী এ শক্তিকে উপেক্ষা করে অথবা এদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি না করে ইসলামের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে পারে না।

তাই এ শ্রেণীর সাথে মত-বিনিময় ও যোগাযোগ ইসলামের চিন্তাবিদ ও আলেম সমাজের প্রধান কর্তব্য যা অগ্রাধিকার ভিত্তিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। নিজেদের ঘরের সন্তান উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যারা রাষ্ট্র যন্ত্রের ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত,

মানসিকতার পরিবর্তন না হলেও মাত্রা কমবে এতে সন্দেহ নেই। দায়ী হিসেবে দাওয়াতী তালিকায় এ শ্রেণীকে অবশ্যই রাখতে হবে।

এ সম্পর্কে মতিউর রহমান বলেন, "ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যড়যন্ত্রই ইসলাম কায়েমের পথে প্রধান বাধা। এসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী শক্তি সমূহের মূলে রয়েছে জায়নবাদী ও ইহুদীবাদী গোষ্ঠী ও তাদের দোসর পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী। তাদের সর্বশেষ কর্মকাণ্ড তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপের মত অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও মর্যাদাহানিকর ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। অপরদিকে বিশ্বায়নের শ্লোগান ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দ্বার রুদ্ধ করা হচ্ছে। বলতে গেলে বিভিন্ন গরীব দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে ব্যাপক গণসচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তাই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার পাশাপাশি দাতাগোষ্ঠীর দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী শর্ত মেনে নেয়ার অশুভ পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সোচ্চার ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তেমনি সাধারণ জনগণকেও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। বিভিন্ন মুখী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার জন্যে জনমত একটা বড় বিষয়। তাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীর যেসব শর্ত সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ বিরোধী, আত্ম মর্যাদার পরিপন্থী, দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে একটা পর্যায়ে সোচ্চার ভূমিকায় আসতে হবে।

বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অযৌক্তিক শর্ত মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিনিধিত্বকারীদের দুর্বল ভূমিকাও একটা বড় কারণ। দেশ ও জাতির প্রতি কমিটমেন্ট এবং বলিষ্ঠ আত্মা প্রত্যয় নিয়ে নিজেদের দেশ ও জাতির স্বার্থের পক্ষে যথাযথ ভূমিকাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা ও নেগোসিয়েশনে ভূমিকা পালনে অক্ষমতা। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যেম তাদের বিবেকের কাছে সঠিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারলে তারা মুসলিমদের সমস্যা অনুধাবন করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা হচ্ছে কিনা বিষয়টি গভীরভাবে মূল্যায়নের দাবী রাখে।

উপরিউক্ত দুর্বলতা দু'টি কাটিয়ে ওঠার জন্য মুসলিম বিশ্বের সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের গভীরভাবে ভেবে দেখার সাথে সাথে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। এরপরও সমস্যার সমাধান যদি ব্যাহত হয় তাহলে স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে খোলা থাকবে গণসচেতনতা ও সোচ্চার জনমত।

চরমপন্থার প্রতিকার

প্রতিকার চরমপন্থার কারণ থেকে অবিচ্ছিন্ন। এর কারণগুলো যেমন বিভিন্ন ও জটিল তেমনি এর প্রতিকারগুলোও। বলা বাহুল্য, কোনো যাদু স্পর্শে চরমপন্থার অবসান ঘটানো যাবে না কিংবা তাদেরকে মধ্যপন্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। মুসলিম বিশ্বের কাছে চরমপন্থা ও গোঁড়ামি এর মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকসহ এটি একটি অদ্ভুত ধর্মীয় সমস্যা। সুতরাং, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সবগুলো দিক বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান যুগের অন্তর্গত পরস্পর বিরোধীতা ও অরাজক অবস্থা এবং ইসলাম থেকে মুসলিমদের বিচ্যুতি চরমপন্থা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অতএব, এ সমাজকেই এর প্রতিকারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে, ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিক, সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নবায়ন করা। এটা কেবল মৌখিক ঘোষণা, কিছু মনোহর শ্লোগান অথবা সংবিধানে 'ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করে নয়, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ঘনিষ্ট অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

লাভ করতে পারলে মনের শান্তিও পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের সে আশায় গুড়ে বালি। তাদের মধ্যে চরম নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। হিপ্পি জাতীয় নানা গ্রুপ নিত্য নতুন গজাচ্ছে তাদের কাছে আধুনিক সভ্যতা অর্থহীন হয়ে পড়েছে, তারা এখন প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চায়। তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। আমি কে? আমার লক্ষ্য কি? আমি কোথা থেকে এসেছি? এখন থেকে আমাকে কোথায় যেতে হবে? কিন্তু পাশ্চাত্যের কাছে এসব প্রশ্নের জবাব নেই। এ প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে কেউ চরম বিধর্মী হয়ে গেছে, আবার কেউবা সত্য পথের সন্ধান পেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সুখের বিষয়, বহু মুসলিম তরুণ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর ইসলামের মধ্যেই খুঁজে পেয়ে নিজেদের জীবনকে ইকামতে দ্বীনের জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত।

ড. ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, "এ পর্যায়ে মুসলিম জাতির কর্তব্য হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত ফিকাহর ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ্য ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। এ ফিকহ শুধু ছোটখাট বিষয় নয়, বরং অপরিহার্য দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে এবং খণ্ড ও অখণ্ড, শাখা ও মূল, মূর্ত ও বিমূর্ত বিষয়গুলোর যথার্থ রূপভেদ ব্যাখ্যা করবে। শুধু শাখা প্রশাখা নয়, মৌলিক উৎস থেকে এ ফিকাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ ধরণের ফিকাহর বিকাশ সহজ কাজ নয়। মানুষের ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন তথা কোনটি সঠিক, কোনটি ভুল তা বিচারের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যে আন্তরিক প্রয়াস, প্রচণ্ড ধৈর্য এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দরকার।আগের গ্রানাডার শেষ শাসক আবু আবদুল্লাহর পতনের সাথে সাথেই স্পেন থেকে মুসলিমগণের শেষ চিহ্নও

মুছে যায়। লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে পাইকারী হারে হত্যা এবং মুসলিম ছেলে ও মেয়েগণকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান করার মাধ্যেম সে দেশ থেকে ইসলামকে পুরোপুরি বিদায় দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত স্পেনে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সেগুলোকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে থাকে। এ সঙ্গে সারাদেশ ব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয়।কিন্তু সম্প্রতি স্পেন সরকার রাজধানী মাদ্রিদে 'ইসলামিক এ্যাসোসিয়েশন অব স্পেন' নামক ইসলামী সংগঠন কায়েম করার অনুমতি দিয়েছেন। এ এ্যাসোসিয়েশন স্পেনে ইসলাম প্রচার, বিভিন্ন শহরে ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের জবাব দান, স্থানীয় ও অস্থানীয় মুসলিমগণের সম্পর্ক জোরদার করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, গ্রানাডা, কর্ডোভা প্রভৃতি ১৩ টি বড় বড় শহরে ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে অমুসলিমগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ সঙ্গে নওমুসলিমগণের দ্বীনি জীবন সংগঠনের কাজও।

বিগত অর্থ শতক থেকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। এ আন্দোলনের জন্য সারা বিশ্বে হাজার হাজার মর্দে মুজাহিদ তৈরী হয়েছে। তারা দ্বীনের জন্য অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করতে মোটেই কুণ্ঠিত হননি। কুর'আনের শাশ্বত বাণীকে সত্য প্রমাণ করে তারা আজো প্রাণ দিয়ে যাচ্ছেন।

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريما

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মান জনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি।" ৩৩:৩২ ইসলামী বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আজ এ প্রাণ উৎসর্গকারী দল তৈরি হয়ে গেছে। তারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেই চলেছে। নিজেদের দেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না। এ অবস্থায় বিরোধী পক্ষ আজ যতই শক্তিশালী হোক না কেন একদিন তাদের ইস্পাতের তৈরি প্রাসাদও ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে।

এ সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও কম প্রণিধানযোগ্য নয়। সম্পর্কে আব্বাস আলী খান বলেন, "ইসলাম তার নিজের দেশে মফলুম হওয়া সত্ত্বেও অন্য দেশে আজ তার প্রভাব বেড়ে চলছে। যে দ্বীন ও জীবন বিধান নিজেকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করার ক্ষমতা রাখে তার বিজয়কে আটকে রাখার ক্ষমতা কারোর নেই। প্রতিপক্ষের যুলুম, নির্যাতন ও মারমুখীতার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধিই প্রমাণ করে যে, তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।"

ইসলামের প্রতি হতে হবে নিষ্ঠাবান

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত চৌদ্দশত বছরের মধ্যে ইসলাম দুনিয়ার সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এর পরিসর বৃদ্ধি হতেই থেকেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.)-র আবির্ভাব কাল থেকে নিয়ে পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত এর গতি ছিল সবচাইতে দ্রুত। এ সময় মনে হচ্ছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য দুনিয়ার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

অর্থাৎ, "এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।" ১১০:০২ ইসলাম একের পর এক এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশ জয় করে নিয়েছে। হিজরী প্রথম শতকের মুসলিমরা ছিলেন কুর'আনের এ বক্তব্যের প্রতিমূর্তি। তারা নিজেরা ইসলামে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন এবং তার বিধানগুলো নিজেদের জীবনে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতেন। তারা একমাত্র আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিলেন। মুসলিমরা যে দেশে প্রবেশ করেছে, তাদের ঈমান, আকীদা, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আব্বাস আলী খান বলেন, "এখন বিশ্ব মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ একমুখী হতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্যদিকে ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আজকের বিশ্বের মুসলিমগণকে একটি শক্তিতে পরিণত করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিমগণের সংকল্পের দৃঢ়তা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিতে সক্ষম হচ্ছে। মুসলিমগণ যতই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ততই বিশ্ব মানবতা ইসলামকে নিজের ধর্ম মনে করতে সক্ষম হচ্ছে।"**

জাতিগতভাবে সুবিধাবাদ ত্যাগ করতে হবে

রাসূলুল্লাহ (স.) এর আগেও কোন কোন নবীকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছিলেন। তারা দীর্ঘকাল আল্লাহর হুকুম ও বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, সমাজ কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন এবং রাষ্ট্র শক্তির সহায়তায় মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণা ও ভাবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) কেও আল্লাহ তা'য়ালা রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং নবীর (স.) তিরোধানের পরও খোলাফায়ে রাশেদীন সে কাঠামোয় কোন প্রকার মৌলিক পরিবর্তন না করেই ৩০ বছর পর্যন্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে নবুওয়াতের প্রতিষ্ঠিত পথে সুসজ্জিত করেছেন। খিলাফতে রাশিদার পর এ কাঠামোয় প্রথম মৌলিক পরিবর্তনের আভাস দেখা দিলে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয় নবীর (স.) পরিবার থেকেই। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এ প্রতিবাদকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার ও কিয়ামত পর্যন্ত একে জীবন্ত রাখার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন। মোহররম মাসের দশ তারিখ হযরত ইমাম হুসাইনের প্রতিবাদ ও প্রাণ উৎসর্গের স্মৃতি নিয়ে আজো মুসলিমদের সামনে জ্বল জ্বল করেছে। সারা দুনিয়ায় মুসলিমগণ এ মাসটিকে শোকের মাস হিসেবে অনুভব করে আসছে। বিশ্বব্যাপী বিশাল উম্মতে মুসলিমার একি দুর্দিন। কোটি কোটি মানুষের শোক প্রকাশ করার জন্য তো ইমাম হুসাইন শাহাদাত বরণ করেননি। তিনি তো কোটি কোটি মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন! কোটি কোটি মানুষের শোক প্রকাশ করার মানেই তো তারা বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করেছেন এবং এর প্রতি নিজেদের সমর্থন জানিয়েছেন। এরপর তো এ বিশাল মানব গোষ্ঠীর চুপ করে বসে থাকা সাজে না।ইমামের মতামত অর্থাৎ খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত বা নবুওয়াতের ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আত্মত্মনিয়োগ করাই ছিল তাদের দায়িত্ব। ইমামের জন্য শোক প্রকাশ করতে তারা প্রস্তুত। কিন্তু ইমাম যে জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সে জন্য নিছক শোক প্রকাশ না করে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে তারা প্রস্তুত নন। এটাকে এক ধরনের সুবিধা ছাড়া আর কি বলা যাতে পারে। এ ধরনের সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করে একটি গোটা মিল্লাত কোন দিন দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য বস্তু থেকে তো তারা দূরে থাকবেই উপরন্তু পার্থিব সাফল্য থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। কাজেই সুবিধাবাদ ত্যাগ করে দ্বীনি ও জাতিগত লক্ষ অর্জনের জন্য মিল্লাতকে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হতে হবে।

অনৈসলামিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিগত দু'শো বছরে মুসলিম দেশগুলোয় যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা মুসলিম বিশ্বের সবচাইতে বড় ক্ষতি সাধন করেছে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সর্বত্র একজোটে মুসলিমগণকে তাদের ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে যার ফলে মুসলিমগণের মাথায় খুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে অমুসলিম মস্তিষ্ক। শিক্ষিত মুসলিম মানেই ইসলাম বিরোধী চিন্তার ধারক, ইসলাম বিরোধী চিন্তার সাথে আপোশকামী, ইসলাম বিরোধী চিন্তার প্রতি অনুরক্ত অথবা কমপক্ষে ইসলাম বিরোধী চিন্তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর শিক্ষিত মুসলিমগণের মধ্যে যারা ইসলামের ওপর এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের এ মনোভাব ও মনোবলের কারণ এ শিক্ষা নয়, অন্য কিছু।ইউরোপের ঔপনিবেশিক প্রভুরা ইসলামকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে তারা ইসলামের আগমনের পথ রোধ করেছে এবং এ জন্য মার্ক্সবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। এমন কি ভারতীয় উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজদের সুযোগ্য নাগরিক ভারতীয় কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহরুও ভারতীয় মুসলিমগণের জন্য ইসলামের তুলনায় মার্ক্সবাদ বেশী ফলপ্রসূ বলে মনে করতেন। পণ্ডিতজী নিজে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে মার্ক্সবাদের প্রসার পছন্দ করতেন না। কিন্তু মুসলিমগণের রোগের জন্য তিনি এটাকেই সবচেয়ে ভালো প্রতিশেধক মনে করতেন। তার মতে, "কুর'আন ও ইসলামের প্রতি মুসলিমগণের অবিচল ঈমান তাদের ইন্ডিয়ান ডোমিনিয়ানকে গভীরভাবে ভালবাসার পথে একটি বড় বাধা। কুর'আন ও ইসলামের প্রতি মুসলিমগণের ঈমানে চিড় ধরাতে না পারলে তারা "ভারত মাতাকে" গভীরভাবে ভালবাসতে পারবে না। আর তাদের এ ঈমানে চিড় ধরাবার ক্ষমতা একমাত্র সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদের করায়ত্ত। পণ্ডিত তাঁর আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। "২৬০ তবে এ ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করা দরকার তা হলো,

এক. মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ইসলামী চিন্তার সাথে সংঘর্ষশীল চিন্তা ও ভাবধারা থেকে পাঠ্যপুস্তক গুলো মুক্ত করতে হবে।

দুই. দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোকে একদিকে ইসলামী ভাবধারা ও মতাদর্শ বিরোধী প্রচারণামুক্ত করতে হবে এবং অন্যদিকে ইতিবাচক প্রচারণার দৃষ্টিতে এ মাধ্যমগুলোকে গড়ে তুলতে হবে।

তিন. অভাব, দারিদ্র্য, দুর্নীতি দূর করার ও চারিত্রিক বিপর্যয়রোধ করার জন্য দেশে ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

মুসলিম জাতির ঐক্যকে আরো জোরদার

ইসলাম বলে সকল মানুষ একই পিতা-মাতার সন্ধান। অল্লাম তা'আলা বলেন।

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خلقكم من نفس واحدة وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا ونساء ، والقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থাৎ, 'হে মানব সমাজ। তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"

যেহেতু সকল মানুষের মূল এক এবং সকলে পরস্পরে একই পরিবারে সদস্যের ন্যায়, সে জন্য বংশ, গোত্র, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কেউ উঁচু ও নিচু অথবা কুলীন ও অকুলীন হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এ বর্ণ, বংশ, দেশ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে কারো ওপরে কারো শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। এর কোনটিই গর্ব অহংকারের কোন কারণ হতে পারে না। এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে রাসূলুল্লাহ (স.) সকল মানুষকে আদমের সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নবীর এ বিপ্লবী ঘোষণা কোন খেয়ালী মতবাদ অথবা সুবিধাবাদ প্রসূত ছিল না। বরঞ্চ দৃপ্তকণ্ঠে একটি ঈমান ও আকিদার ঘোষণা ছিল। এমন সময়ের ঘোষণা যখন আরব অনারব নির্বিশেষে মানুষকে বর্ণ, বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদেরকে অপর থেকে অতি উচ্চ ও অভিজাত মনে করত এবং তাদের কাছে অপরের জান মালের কোন মূল্যই ছিল না। বংশীয় আভিজাত্যের গর্বে যারা গর্বিত ছিল, যারা অপরকে দাসানুদাস বানিয়ে রেখে তাদের রক্ত পানি করা শ্রমের বদৌলতে নিজেদের ভাগ্য গড়েছিল তারা এ বিপ্লবী ঘোষণা মেনে নিতে পারে কি করে? কিন্তু জাহিলিয়াতের অন্ধ আবেগে যারা সদা বিভ্রান্ত ছিলো না, যাঁদের মধ্যে সামান্য বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা ছিলো, তারা এ বিপ্লবী ঘোষণার মধ্যে উপলব্ধি করলো মানব জাতির ঐক্য এবং মানবতার প্রকৃত মর্যাদা। আর ইসলামই মানবতার এহেন মর্যাদার একমাত্র ধারক ও

বাহক।বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য ও বিভেদ ভুলে মুসলিম ঐক্যকে জোরদার করা আবশ্যক। সমস্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয়কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করতে হবে। এম, এ সাঈদ বলেন, মুসলিম বিশ্বের পতনের অন্যতম কারণ অনৈক্য ও বিভেদ। এর সুযোগ নিচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের দুশমনেরা। অনৈক্য ও বিভেদের কারণে একশ পঁচিশ কোটি মুসলিম ও অর্ধশতাধিক মুসলিম দেশ ঐক্যবদ্ধ কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে না।যদি মুসলিমগণ সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ হতে পারত তারা আজ এত লাঞ্ছিত, অপমানিত হতো না। তাই মুসলিম বিশ্বের ঐক্য একান্ত প্রয়োজন।

দাওয়াতি কার্যক্রমের প্রসার

ইসলামি জীবন ব্যবস্থা একটি সাময়িক জীবন ব্যবস্থা নয়। ইতিবাসের কোন এক অধ্যায়ের জন্য তা অবতীর্ণ হয়নি। কোন একটি সংকীর্ণ পরিবেশের জন্যও তা প্রেরিত হয়নি। কোন বিশেষ পরিবেশ বা জাতির জন্যও তা নির্দিষ্ট হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এটি এচ্ছে গতিশীল। মানবজীবনের জন্য একটা মৌলিক বিধান। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তাঁর জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনই এক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই ইসলামি আন্দোলনের জন্য আজ এটা বড় কাজ যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোটা মানবজাতির সামনে ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। মানব জাতির সামনে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলাম যে সত্যের ধর্ম তা সবার মাঝে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীরা সাওয়াতী কাজের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সাধারণ জনগণ এ আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার

বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন ইসলামের সত্যিকার রূপকে মানবজাতির সামনে প্রজুটিত করা। ইসলাম এবং ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা খেলাফতই যে মুক্তি, কল্যাণ ও অগ্রগতির প্রকৃত পথ তা বলিষ্ঠভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। কাজ ও বান্ধব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ইসলামি আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে।পাশাপাশি চরমপন্থীরা ধর্মীয়ও বিষয়ে অজ্ঞ কিংবা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। তনুপরি তাদের জ্ঞান অনুযায়ী দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তারা অপ্রয়োজনীয় ব্যখ্যা উপস্থাপন করে সাধারণ জনগণের মাকে তারা ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। যার কারণে সাধারণ জনগণ তাদের কথায় ভুল পথে ধাবিত হয়। সুতরাং, তাঁদের মোকাবেলায় শরয়ী ও ধর্মীয় জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসার আবশ্যক। পাশাপাশি পৃথিবীর সকল মানুষের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করার জন্য কিছু লোককে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

মুসলিম বিশ্বকে সকল ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে দ্রুত বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। পশ্চিমা ঋণদাতা দেশ সমূহ এবং বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর শর্তাধীন ঋণ গ্রহণের ফাদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ জন্য মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত জরুরী। তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর উচিত হবে ক্রমান্বয়ে তাঁদের ব্যাংক আমানত পশ্চিমা দেশ গুলো থেকে স্থানান্তর করা। পশ্চিমা এনজিও সমূহ মুসলিম দরিদ্র দেশগুলোতে যে অবাধ বিচরণ করছে তাঁর মোকাবেলায় মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য ও সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বকে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমেরিকা নিজেই এখন বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ। আমেরিকার বর্তমান বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩০০ বিলিয়ন ডলার। তাঁর ঘাটতি অর্থনীতিতে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা তত সহজ নয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ওলামায়ে কেরাম আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তাদের এ অনুপস্থিতিই চরমপন্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। কেননা আলেমগণ তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন না করায় দেশের শাসক হয় স্বৈরাচারী, জনগণের কল্যাণের কোন ইচ্ছা তাদের নিকট প্রাধান্য পায় না, নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কেবল দুনিয়াবি সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধান করে, তাদের উদাসীনতায় যুব সমাজ পাংস হয়, জাতি ধাবিত হয় অবক্ষয়ের দিকে। কিন্তু আলেমগণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলে তারা দেশের শাসককে উপদেশ দান করতে পারেন, যুবকদেরকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে ফিরিয়ে

এনে কল্যাণ ও আদর্শের পথে পরিচালনা করতে পারেন। তারা সামাজিক বিপথগামিতা, চরমপন্থাসহ বিভিন্ন সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারেন।

ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা

ইসলামি সরকার কায়েম করা ছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সুফল মানবজাতি পেতে পারে না। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্র শক্তিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামি সরকার গঠনের জন্য বিশেষ করে মুসলিম দেশের ইসলামি আন্দোলন সমুহকে রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইসলামি সরকার গঠন এখন অনেক দেশে সময়ের ব্যাপার মাত্র।আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না হওয়ায় কিছু দেশে চরমপন্থার উদ্ভব ঘটেছে। এজন্য মুসলিম শাসকদের ওপর ওয়াজিব হল আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিচালনা করা। আর এক্ষেত্রে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সবই পরিচালিত হতে হবে শরীয়তের আলোকে। শরিয়ত পরিপন্থী বিষয়গুলোকে সুকৌশলে পরিহার করতে হবে।

চরমপন্থীদের সাথে সংলাপ ও বাস্তবতার বিশ্লেষণ

আলোচনা পর্যালোচনা ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে আনা যায়। নবী করীম (সা.) তার যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছিলেন। সাহাবীগণের যুগেও চরমপন্থীদের সাথে আলোচনার এ ধারা অব্যাহত ছিল। যেমন হযরত আলী (রা.) প্রথমে খারিজীদের সাথে আলোচনা করেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)ও তাদের সাথে আলোচনা করেছিলেন, যার ফলে তখন প্রায় ২০০০ লোক পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে। আর এ ধরনের আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে চরমপন্থা দমন করা যায়।

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয় সম্পর্কে অনেক মানুষ অজ্ঞাত থাকে। অনেক লেখক, বিদ্বান ও রাজনীতিক চরমপন্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে বিভিন্ন চরমপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি ধর্ম-কর্ম পালনকেও অনেকে চরমপন্থা বলে আখ্যায়িত করে। এজন্য চরমপন্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে সকলের নিকট তা সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। যাতে করে তার মন্দ দিক সম্পর্কে সবাই সম্যক অবহিত হতে পারে। সাথে সাথে তা থেকে বিরত থাকার জন্যও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। কেননা বাস্তব অবস্থা না জানার কারণে অনেক মানুষ এটাকে ভালো মনে করে তার সাথে জড়িয়ে পড়ে। গোঁড়ামি ও চরমপন্থা উদ্ভবের কারণ কিছু জায়গায় যেহেতু বুদ্ধিভিত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক, সেহেতু তা প্রতিকারের জন্যও ঐ সবগুলো দিকগুলো বিবেচনা করে ইসলামের আলোকে তার সমাধান করতে হবে।

নিজস্ব তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার

মুসলিমগণের নিজেদের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে নিজেদেরকে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। তাই শত্রুদের সার্বিক পরিস্থিতি মুসলিমগণের জানা বাকা প্রয়োজন। এছাড়া বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্ব মিডিয়ার দিক থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে। তাই এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব শক্তিশালী ও মান সম্পন্ন মিডিয়া নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। যদি মুসলিমগণ এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে তাহলে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন থেকে ঈমানও আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না।

পাশাপাশি চরমপন্থীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল আমা'আতের মাধহাব বহির্ভূত এবং শরীয়তের আক্বীদার বিপরীতে ভিন্ন আক্বীদা পোষণ করে। আর তারা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। এজন্য তাদের মোকাবেলায় বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রসার ও প্রচার জরুরী। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ মসজিদ ও মক্তবে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকায় এ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। এছাড়া চরমপন্থার হিংস্র ছোবল থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য আলেমগণকে সমাজের মানুষের আক্বীদা সংশোধনের লক্ষ্যে যথাযথ সাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

ও.আই.সি.কে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদান ও আধুনিক অস্ত্র তৈরীর সামর্থ্য অর্জন

ওআইসিকে কার্যকর ও শক্তিশালি করা এবং উদ্যোগী ভূমিকা পালনের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। যে প্রত্যাশা নিয়ে ওআইসি গঠিত হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। যেহেতু পাশ্চাত্য তাঁর স্বার্থের বিনিময়ে কোন মুসলিম দেশ বা শাসককেই আনুকূল্য প্রদর্শন করবে না। তাই শুধু ওআইসি নয়। বরং ওআইসির অধীন বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে কার্যকর ও শক্তিশালি করে গড়ে তোলা আজকের বিশ্ব মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য।

পাশাপাশি মুসলিম বিশ্ব অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে পারলেই ভারসাম্য সৃষ্টি সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত হবে। তাই মুসলিম বিশ্বকে অবশ্যই সামরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। তবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে অস্ত্র কিনে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র তৈরিতে মুসলিম বিশ্বকে সামর্থ্য অর্জন করা দরকার। মুসলিম বিশ্বের দুশমনদের হাতে পারমানবিক অস্ত্র থাকবে, আর মুসলমি বিশ্ব অসহায়ের মত অন্যের করুণার ওপর নির্ভর করবে এটা দীর্ঘদিন বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এভাবে চলতে দেয়া যায় না। তাই পারমানবিক শক্তি অর্জন করার জন্য মুসলিম দেশসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ও সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদ বিরোধী জনমত সৃষ্টি

মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা। উন্নয়নের শর্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশ্চাত্যই এখন গণতন্ত্রকে ভয় করছে। মুসলিমগণের জন্য গনতন্ত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া হিসেবে ভয়ের কোন কারণ নেই। বরং গণতন্ত্রের ফসল ইসলামি বিপ্লবের জন্যই সহায়ক হবে।

সংকট উত্তরণে আরো কিছু পদক্ষেপ

মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে সামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন,

১. ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী যথাযথভাবে বিশ্ববানীর কাছে তুলে ধরতে হবে। ইসলাম যে সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে, সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তা তুলে ধরতে হবে।

২. মদীনা সনদের শিক্ষার আলোকে সহাবস্থানের ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে।

৩. হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়কালে মহানবী (স.) পরমত সহিষ্ণুতার যে অসামান্য আদর্শ মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছেন তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।

৪. মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও সংঘর্ষের অবসানকল্পে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে

৫. ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তারা কাদের প্ররোচনায় কাজ করছে এবং কাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, মুসলিম যুবসমাজের কাছে তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।

৬. মুসলিম উম্মাহর সম্ভাবনাময় যুব সমাজের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. যুদ্ধ ও সংঘাতের মাধ্যেম কারা লাভবান হচ্ছে এবং এর পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহর কি ক্ষতি হচ্ছে তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।

মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ

ড. ইউসূফ আল কারজাতী মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে মুসলিম তরুণদের প্রতি কিছু উপদেশ ব্যক্ত করেছেন,

প্রথমত: মুসলিম সমাজ পূর্ব ও পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করা মতবাদ দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এখন মুসলিম বিশ্ব ইসলামের অনিবার্য সমাধানে বিশ্বাস করে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহর বাস্তবায়ন চায়। অতএব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম তরুণদের সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
দ্বিতীয়ত। মুসলিম তরুণদের মধ্যে যে গোঁড়ামি রয়েছে তা হিংসা ও হুমকি দিয়ে পরিশুদ্ধ করা যাবে না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি এদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় মুসলিমগণের কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মন-মানসিকতা উপলব্ধি করা এবং বুদ্ধিভিত্তিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণ্য দূর করতে উদ্যোগী হওয়া।

মূসলিম উম্মাহর সংকট। উত্তরণের উপায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

. ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

উপসংহার

আজকের মুসলিম জাতি প্রকাশ্যেই তাদের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তারা মুনাফিকীর জীবন বেছে নিয়েছে। তারা সত্যিকার মুসলিমদের সাথেও নয়, আবার পুরাপুরি ইসলামের শত্রুদের সাথেও নয়, বরং এর মাঝামাঝি একটা পথ বাছাই করেছে, যার চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য একেবারে অস্পষ্ট। তারা আজ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেও কোন অগ্রগতি বা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিণতিতে শুধু পিছিয়ে পড়েছে। এটাই হল প্রকৃত বিপর্যয়। যে ব্যক্তি নিজের আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছে, হোক তা সামাজিক আবহাওয়ার প্রতিকূল, তার আদর্শের পতাকা শত প্রতিবন্ধকতায়ও সমুন্নত রেখেছে। সেই পারে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কুরবানী করতে, ত্যাগ স্বীকার করতে। আর যে ব্যক্তি নিজের আদর্শে অটল নয়, সামাজিক আবহাওয়ায় যার আদর্শ বারবার বদলে যায় সে কিছুই করতে পারে না। পারে শুধু নিজের সাথে প্রতারণা করতে। এটাও মানসিক বিপর্যয়।

কিন্তু, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ থাকা অনিবার্য-ফরয করে দিয়েছেন। তাছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার বিকল্প নেই। জামাতবদ্ধতা স্বয়ং এক বিরাট শক্তি। কোনো সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে সহজে কেউ পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। একতা, সংঘবদ্ধতা, ত্যাগ ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমেই কোনো জাতি হতে পারে বিজয়ী, লাভ করতে পারে সম্মান, সাফল্য ও উন্নতি। যে কোনো শত্রু এমন জাতিকে সমীহ করে চলতে বাধ্য। এমন জাতিকে পর্যদুস্ত করা সহজ কথা নয়। এমনকি তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করারও কেউ থাকে না। এমতাবস্থায়, মুসলিম জাতিকে সহীহ ঈমানের তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কারণ বিপর্যয় উত্তরণের এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার প্রথম পদক্ষেপই হলো বিশুদ্ধ ঈমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ। কাজেই আবাল-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ তথা সর্বস্তরের মুসলিমদের খালেস দ্বীনের পূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ঈমানের এমন স্তরে পৌঁছতে হবে, যে স্তরে পৌঁছে তারা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে ভয় করবে না। ঈমান কোন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির নাম নয়, যা কেবল চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য বিশুদ্ধ ঈমান আক্বীদাকে প্রকৃত অর্থে অন্তরে স্থাপন করতে হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন ঘটাতে হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এক শ্রেণীর লোকের কাছে ঈমান শুদ্ধকরণ ও তা কর্মজীবনে বাস্তবায়নের কোন গুরুত্ব নেই। অধিকন্তু সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, কমুনিজমসহ সকল ইসলাম-বিরোধী অপশক্তি ও ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সহীহ আক্বীদা বিশ্বাসই পারে কথা বলার শক্তি ও সাহস যোগাতে, চিন্তা ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে এবং সর্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র ফুটিয়ে তুলতে। মুসলিমগণ যখন

সঠিক আক্বীদা শিক্ষা লাভ করবে তখন বস্তুর শুভাশুভের ধারণাকে ভিত্তিহীন বলে জ্ঞান করবে। তারা আরও বুঝবে যে, এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জাহেলী যুগের মানুষদের কতই না বিপর্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়েছে, তখন মুসলিমগণ এ অমূলক ধারণাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। বস্তুতঃ এতদ্বিষয়ে যখন মুসলিমগণের বোধ ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাঁরা বাস্তবিকভাবেই প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হবে এবং তাঁদের জীবনে এক ক্রিয়াশীল নব অধ্যায়ের সূচনা হবে।

পাশাপাশি, জাতির মেরুদন্ড যুব সমাজকে উন্নত চরিত্র, উচ্চাকাঙ্খা ও বীরত্বের দীক্ষা দিতে হবে। গাফলতীর ঘুম ভেঙ্গে যুবকদেরকে ইসলামী পুনর্জাগরণের সব চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবীদেরকে উচু মনোবল ও বীরত্বের শিক্ষা দিতেন। সে সঙ্গে যে সকল কাজের দ্বারা হীনমন্যতা দূরিভূত হয়ে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়, সে সব কাজে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। সুতরাং, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হবে 'হাবলুল্লাহ বা আল্লাহর রশি'। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব আল কুর'আন ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (স.) কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এ দুটির পূর্ণ অনুসরণ তাদেরকে করতে হবে। সবাই ভাই ভাই হিসেবে একযোগে দীনের এ ভিত্তিদ্বয়ের আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। সবাই পরস্পরকে এ দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সহযোগিতা করবে। কোনো জাতির কাছে যদি শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ ও নিখুঁত জীবন-ব্যবস্থা বর্তমান থাকে এবং সে জীবন-ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকে, তবে সে জাতির জন্যে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব আরো অনেক অনেক বেশি। সংগঠিত হওয়া ছাড়া সাধন করা যেতে পারে না কোনো বিপ্লবই। সংঘবদ্ধতা ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে না। ঐক্যের পথে এগিয়ে যাওয়া হবে মুসলিম বিশ্বের শান্তি, অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দু'টি কারণে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি হলো ধর্মজ্ঞানের অভাব, অপরটি অনৈক্য। অনৈক্য শুধু তাদের জাগতিক দুর্দশার জন্য দায়ী নয়, ধর্মীয় অধঃপতনেরও কারণ। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, বর্তমানের তথাকথিত এই মুসলিমরা একথা বুঝতে অক্ষম যে পৃথিবীতে তারা যে কত অবহেলিত ও অপমানিত। তারা যে নিজেদের লোক দ্বারা চরমভাবে শোষিত ও প্রতারিত এ বোধশক্তিও তাদের নেই। জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে মুসলিমরা এখন চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মুসলিমদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাদের সার্বিক অধঃপতনের মূল কারণ ধর্ম বিসর্জন, অন্যান্য কারণ আনুষঙ্গিক। এই অবস্থায় এখনও মুসলিম বিশ্ব যদি ধর্মকে আঁকড়ে না ধরে তাহলে সংখ্যায় মুসলিমগণ প্রতিদিন বাড়তে থাকলেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এদের অধঃপতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। ঐক্য ছাড়া

কোনজাতি কোন ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে-মানব ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং এ অবস্থায় মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈমানের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম দেশ সমূহে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, জাতিগত সুবিধাবোধ ত্যাগ, অনৈসলামিক চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ, চেতনা বোধের প্রশিক্ষণ, শিল্প প্রযুক্তি ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রচার-প্রসার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে মুসলিম জাতি আবারো তাদের হারানো দিন ফিরে পাবে। পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে পারবে। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের জীবন পরিচালনা করে এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত নিশ্চিত করতে পারবে।